# ইঙ্গিং

'প্রবাসী'

অমিয় রায় চৌধুরী ( দাশগুপ্ত )

প্রকাশক
সুভো ঠাকুর
ফিউচারিস্ট পাব্লিসিংগ হাউস
৩৫ই কৈলাস বসু স্ট্রীট্
কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীগোপাল চন্দ্র বসু
কহিনুর প্রিন্টিংগ্ ওয়ার্কস
১০৮ আম্হারষ্ট স্ট্রীট্
কলিকাতা

-লেখকের অন্যান্য বই-

—তরুণ, সাথী, রক্ত-নদী, ভুলের ব্যথা—

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

—সুর সুরা আর নারী—

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশকের নিকট এবং

এস্ গুপ্ত এণ্ড সন্স

২০৩।২ কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীট্

কলিকাতা

মূল্য

এক টাকা আট আনা

বর্দ্ধমানের সর্ব্বজনপ্রিয়

সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম এ, বি এল মহাশয়ের

করকমলে

অনেকের মতেই উপন্যাসের একটা ধরাবাঁধা গণ্ডি আছে, নির্দ্দিষ্ট একটা সুর আছে যার বাইরে গেলেই হয় রস-ভঙ্গ। কিন্তু আমি আমার সীমানা সৃষ্টি করেছি নিজের প্রয়োজনের অনুপাতে। তাই গণ্ডির জ্ঞানে গরীয়াণ যাঁরা, তাঁরা হয়তো একে উপন্যাস ব'লে স্বীকার নাও ক'রতে পারেন কিন্তু আমি 'ইঙ্গিৎ'কে উপন্যাসই ব'লছি। যতোদূর স্মরণ হয় বাংলা সাহিত্যে নায়িকাবহুল উপন্যাস একরকম নাই বলা চলে, সেজন্য যে কারো কোনরূপ অসুবিধা হবে এরূপ মনে হয় না।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লেখক ও পাঠকের মধ্যে মনের কোন মিলন নাই, বুদ্ধির এবং চিন্তার নাই কোন আদানপ্রদান, পাঠক সম্প্রদায় চিরদিনই নিষ্ক্রিয়, তার ফলে অনেক লেখকের শ্রমই হয় নিষ্ফল, তার জ্ঞান হয় লাঞ্ছিত। কিন্তু আজ ঐ শ্রেণীর বাইরে কি কোনও পাঠক নাই···যারা লেখকের প্রত্যেক চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের একটা সমন্বয় সৃষ্টি ক'রে নিয়ে লেখকের উদ্দেশ্য সন্ধান ক'রতে পারেন?

এটা যাঁরা পারবেন···তাদেরই জন্য আমার এ 'ইঙ্গিৎ'। ছাপার হরপে লেখা যা রয়েছে তাই আমার বক্তব্য নয়, 'ইঙ্গিৎ' পড়ে পাঠক পাঠিকার মনে যে চিন্তা জাগবে, বিভিন্ন মতামত, রুচি ও অনুভূতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে যে ভাব ও রসের সৃষ্টি হবে তারই প্রতি আমার 'ইঙ্গিৎ' এবং সেই আমার লক্ষ্য। তাই ইঙ্গিতের পাঠকের দায়িত্ব লেখকের চেয়ে কম নয়। আমার পূর্ণতার যতোটুকু আনন্দ সমস্তই নির্ভর ক'রেছে তাঁদেরই উপর।

* * * * *

ইঙ্গিতের সূচনা হতে আমি যাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে মায়া সেন, আশু ভট্টাচার্য্য, বীরেন গুপ্ত এবং রবী সেনের নাম বিশেষ স্মরণীয়।

শ্রীযুক্ত পরেশ বাবুর সাহায্য ভিন্ন ইঙ্গিৎ কিছুতেই এই অল্প সময়ের মধ্যে বেরোতে পারত না। ইঙ্গিতের পশ্চাতে তাঁর শ্রম যথেষ্ট রয়েছে।

ছাপার ভুল ত্রুটী রয়ে গেল যথেষ্ট সেটা স্বীকার ক'রতেই হবে, নিরূপায়ে পাঠক পাঠিকা আশা করি মার্জ্জনা ক'রবেন।

মহালয়া, ১৩৪১। }<br>
কাজুলিয়া, ফরিদপুর। }

বিনীত—<br>
গ্রন্থকার।

……হু হু শব্দে ট্যাক্‌সি ছুটে চলেছে। আরোহী চারটী তরুণী। সবাই নীরব, কারো মুখে কোন কথা নাই। দূরকে নিকটে এনে, নিকটকে দূর ক'রে ট্যাক্‌সিখানা ছুটে চলেছে সুদূর সম্মুখের মুখে। অবশেষে সে স্তব্ধতা ভাঙ্গল রেবা: কি গো লী! কি ভাবছিস্ বল তো?

লীনা তার বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে একটু হাসল মাত্র।

জানি ও হাসি। কিন্তু ও হাসির অর্থ কি?

জগতের সব কিছুরই কি অর্থ থাকবে রে?

কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বে যা হ'য়ে গেল, তুমি কি বলতে চাও তার কোনও অর্থ নাই?

নীলিমা বলল: আমার তো তাই বলেই মনে হ'ল, অবশ্য এক পক্ষের।

…আচ্ছা, লী এই কেলেঙ্কারীটা কেমন ক'রে ক'র্‌তে পারল বল দেখি?

হেনার কথায় হেসে রেবা বলল—কেন? কেমন ক'রে পারল তুই দেখতে পাসনি? কি ভাবছিলি তখন?

রেবার কথায় খেয়াল না ক'রে হেনা বলল—ধন্যি তোকে লী, সত্যিই তুই এ-যুগের মেয়ে বটে!

রেবা বলল: আর তুই? তুই কোন যুগের হে? তোর তখনকার অবস্থা

দেখে তো মনে হচ্ছিল তুই সেই কি বলে…সেই তথাকথিত শ্লীল যুগের।…

ঈষৎ কোপের সঙ্গে হেনা বলল : বটে!

হেনার চিবুকখানি ধরে নীলিমা বলল : বটে কি লো? সেই থেকে তোমরা ও বেচারীর পেছনে যা লেগেছ! …কিন্তু ও বলেই ফিরে এসেছে,… তুই হ'লে হয়তো বা সঙ্গ নিতিস্।

ওঃ, খুব যে দরদ দেখছি তার জন্য! আমরা বুঝি এতই সুলভ? পাশে গিয়ে আগে কে বসেছিল?

তোমার বসতে না পারার দুঃখে আমি তোমাকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আর, তুমি যা পারোনি,—তাই পারার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নইলে পরের মোটরটা এগ্‌জামিন করবার খেয়াল কোন্ ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় আগে এসেছিল হে? সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশংসা সে পেতে পারে।

নাঃ, অত বেহায়াপনা আমি বরদাস্ত করতে পারিনা, পছন্দও করিনা।

সুযোগ বা দুর্যোগ, যাকে পিছলে পড়বার অবকাশ দেয়নি; তার না-প'ড়ে যাওয়ায় তেমন কিছু বাহাদুরি আছে ব'লে তো মনে করতে পারি না। তুই কি বলিস লী?

নীলিমার কথায় লীলা তার ক্লান্ত দৃষ্টি তুলে বলল : আমি শুধু ভাবছি… লেক্ শুদ্ধ মানুষগুলো আমাদের না জানি কিই মনে করেছে! ছি ছি ছি…

দেখিস, কাল হেটে ক্লাসে যেতে পারবি তো, না ঘোমটা দেওয়া সেই রিক্সা ক'রেই যাবি?

নীলিমার কথা শেষ না হ'তেই রেবা গর্জ্জে উঠলো : ওঃ, তাদের লজ্জায় ওঁর পথ চলা হ'ল ভার, আর গাড়ীর ভেতরে যারা বসেছিল তারা কি সব শিখণ্ডী না বৃহন্নলা?

…এই রোখ্‌খো।

বিডন ষ্ট্রীটের একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে ট্যাক্‌সিখানা দাঁড়াল।

নামতে নামতেই রেবা বলল: আমার বন্ধুই হ'ক আর যেই হ'ক, বড্ড দেমাক, না হে? নইলে বলল কি না লাগেজ্‌!

হেনা ভিটো দিল: মানুষকে যেন মানুষ বলেই মনে কত্তে পারে না! যেন একবারে·····

তার সেই খেই হারাণ কথাটিকে টেনে নিল নীলিমা। মৃদু হেসে সে বলল: নিজের মাঝেই যে পূর্ণতার আনন্দ লাভ ক'রেছে, তার অমিই হয় হে। ষ্টাণ্ডারড্‌ নিয়েই হ'চ্ছে কথা। মানুষ বল্‌তে সে যা বোঝে বা চায়, হয়তো তোমাদের মধ্যে তা সে পায়নি। তাই···

তাই···তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি লীর মাঝেই তলিয়ে গেল,···কেমন?

সে কথার কেউ কোনও জবাব করল না, নিঃশব্দে সকলে সিঁড়ি ধরল।

লীলার কানে বাজছিল তখন, নদীর কানে যেমন ক'রে বাজে মহাসাগরের ভীম কল্লোল; তেমনি করেই বাজছিল সেই অদ্ভুত লোকটার কঠিন মধুর কথাগুলো। বারবারই শুধু মনে হচ্ছিল তার, "মরিয়া অমর হব তোমার প্রেমেতে"। উঃ কি সৃষ্টিছাড়া লোক!

খেয়াল হ'ল সে তার ঘরে পৌঁছে গেছে। শূন্য ঘর। লীলা অবসাদে শয্যার 'পরে বসে পড়ল, তারপর শুয়ে পড়ল আড় হ'য়ে। বুকের চাপে অনুভব করল একখানা বই কিন্তু ন'ড়ল না। কয়েক মিনিট মাত্র। হলঘরের মাঝে একাধিক কণ্ঠ শোনা যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে এসে আবার শয্যায় ব'সল। কি ভাবছিল সে?

কয়েক মিনিট পরে উঠে গিয়ে সে দাঁড়াল বড় আর্সিখানার সমুখে। মনে হ'ল, "নমস্কার করব না শেকহ্যাণ্ড করব"। নিজের অবসন্ন মূর্তির প্রতিবিম্ব

দেখতে দেখতে সে আবিষ্ট হ'য়ে পড়ল। ষোড়শবর্ষের প্রসাধিত সম্ভার, তনু-তটে অতনুর অপরূপ মাধুর্য্য-বিকাশ দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে আজ তাকে চকিত ক'রে তুল্‌ল। মুগ্ধের মত সে চেয়ে রইল সেদিকে, যেন সে এ কার মূর্ত্তি দেখছে। কোন্ অপরূপার সঙ্গে যেন আজ তার এই প্রথম পরিচয়।

সহসা হলঘর হ'তে ভেসে এল উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি আর তার রুদ্ধ দ্বারের উপর দমাদম্ শব্দ। দরজা খুলতেই সে একাধিক বাহুর মাঝে বন্দী হ'য়ে পড়ল।

Cheer up my sweet girl.

Let her kiss at first ...

Kiss ! whom ?

...Success . I mean.

তাইতো বলি ! যার মুখরতায় হোষ্টেল শুদ্ধ সকলকে হ'য়ে থাকতে হয় মূক, আজ তার এই হঠাৎ-নীরবতার কারণ কি ? যাক, লী ! আমি তোমায় আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমরাও সব।...

হতভম্ব লী শুধু বলল : থাম বাপু সব চুপ কর।

একটী মেয়ে কপট ঔদাসিন্যে গেয়ে উঠলো :

কেন সই মুখরতা ?
মুখ খুলিলে সুখ থাকে না
লুকিয়ে রাখো মনের কথা।
অন্ধ রাতের তারায় তারায়
কথা যে হয় ঐ ইসারায়,
জোনাকি জানে কি হায়
গোপন তাদের সে ধারতা।

তোরা সব এ কি বলছিস, বল তো ? মাথা মুণ্ডু আমি তো এর কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না।

লীলার কথার সঙ্গে সঙ্গে অমলা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। ওঃ, তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে, দেখছি !

ডলি কপালে হাত দিয়ে বলল : হা হতোস্মি ! রে পোড়ারমুখী আমাকে যাবার জন্য একবারটীও বললে না !

হাসতে হাসতে রেবা, নীলিমা ও হেনা ঘরে ঢুকল। ডলির কথার উত্তরে হেনা বলল : গিয়েও তো ভাই বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত বলে আমার মনে হয় না। যাকে বলে সুযোগ-সৃষ্টি, তা করতে গিয়ে হয়তো শেষটায় লীর সঙ্গে ঝগড়াই সুরু হ'ত।

আমরা চারজনে যার একটা সাইড্‌ও পূর্ণ করতে পারিনি, সেখানে আর দু'চারজন সঙ্গে থাকলে ঝগড়া করবার মত অবস্থা হ'ত বলে আমার মনে হয় না।

লীলার এ কথায় কে একজন বলে উঠল : হিয়ার দি 'সাইকোলজী' !

বিরাট অন্তর তার আকাশের মত,
তারকা তাহার বুকে নারী মোরা শত শত।

সকলে একযোগে মরিয়া হ'য়ে চিৎকার করে উঠলো : শাট্ আপ্। এ-যুগের মেয়ে হ'য়ে মেয়েদের তুমি এত সুলভ ব'লে মনে করতে পারলে কি ক'রে ?

পাশের চেয়ারটার উপর বাঁ পা'টা তুলে দিয়ে হেনা বলল : যাক্, এ নিয়ে আর কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। যার যা আছে তারই তা থাক, বিশেষ ডলি গিয়ে বসতই বা কোথায় ?

কেন ? ষ্টেয়ারিং আর তার দেহের মাঝে যেটুকুন স্পেশ্, সেখানে তোমাকে বসিয়ে তোমার যায়গাটাতেই ডলিকে বসানো যেতো।

লীলার কথায় সকলে একযোগে উচ্চরবে হেসে উঠল। সহসা রেবা বলে উঠলো : হয়েছে ! এবার স্থরু হবে পাকামো পর্ব্ব।

তার কথায় সকলে পিছনে তাকিয়ে দেখল হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে ঘর্ম্মাক্ত স্থলেখা ঘরে ঢুকছে। সকলে আসন্ন ঝড়ের অপেক্ষায় সতর্ক হ'য়ে বসল। কোন ভূমিকা না করেই স্থলেখা বলতে স্থরু করল : আচ্ছা তুই-ই একবার বলতো রেবা ?—এ যুগের মেয়ে হ'য়ে তোরা যে-কাণ্ডটা করে এলি, তাতে নিজেদের 'ফর'এ তোরা কি বলতে পারিস ? বিংশশতাব্দীর মেয়ে তোরা, তাতে সব একযোগে প্রেমে পড়ে গেলি একটাতেই ? আশ্চর্য্য !

রেবা বলল : যা খুশী তাই যে বড় ব'লে চলেছিস, কিছু না শুনেই ?

সে কথা কানে না তুলে স্থলেখা বলতে লাগল : তোরা ভুলে যাস কেন যে এযুগে প্রেম অর্থ পাপ। সাম্যের যুগ যদি না আসে, পুরুষ ও নারী উভয়ের মাঝে যদি সমান অনুভূতির স্থযোগ না থাকে তবে প্রেম স্থায়ী হ'তে পারে না।

ডলি প্রশ্ন করল : তাই বুঝি স্বাধীন দেশের মেয়েরা প্রথম প্রেমেই বে করে না ?

নিভা বলে উঠল : হাঁা, সেদেশের মেয়েরা প্রথম প্রেমে বে করেনা আর এদেশের মেয়েরা প্রেম ক'রে—বে করে না, বে ক'রে প্রেম করে ; পার্থক্য এইটুকুন।

অমিতা বাধা দিয়ে বলে উঠল : ভুল বললে নিভা। পার্থক্য একটু আছে বটে, তবে ঠিক অমনটী নয়। এদেশও প্রগতির পথে এগিয়েছে অনেকখানি···

নীলিমা প্রশ্ন করল : কিন্তু···কোন পথে ?

অমিতা উত্তর করল : নিভা তো বলল, এদেশের মেয়েরা প্রেম ক'রে বে করে না ; বে ক'রে তবে প্রেম করতে শেখে: যেন স্বামীদেবতাই এদেশের

মেয়ের একমাত্র প্রেমের গুরু। অবশ্য বাংলায় এ একদিন ছিল কিন্তু আমি বলছি সে দিন আজ আর নেই।

রেবা রাগতস্বরে বলে উঠল: বড্ড ফেনাচ্ছিস কিন্তু। তুই কি বলতে চাস? পার্থক্যটা···

না, পার্থক্য কিছু নেই। প্রেম তারাও করে এরাও করে। তারাও প্রথম প্রেমে বে করে না, এরাও করে না। তারা করে না ইচ্ছা ক'রে, আর এদের ইচ্ছা থাকলেও করা হয় না।

······অর্থাৎ সেদেশের জারিজুরি এদেশেও আজকাল চলে যাচ্ছে। কেমন এই তো?

রেবার কথা শেষ না হ'তেই অমিতা তাকে বাধা দিল: না না, ভুল ক'রনা রে-দি। আমাদের দেশের মেয়েদের ও-বদনাম আমি দিচ্ছিনা, তবে ··

কি···তবে? পরিষ্কার ক'রে ভেঙেই বল?

পরিষ্কার আর কি? এ তো সোজা কথা; বুঝতেই পারো। প্রেম করার হাত আমাদের আছে স্বীকার করি, অবশ্য গোপনে অন্তরে অন্তরে, কিন্তু চিরদিনের জন্য যে লাইসেন্স বা আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ বিবাহ—সে তো আর আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে নেই, সেটা অভিভাবকদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। কাজেই গোপন পর্ব্ব যেটুকুন সেটুকুন আমরা শেষ করি, পরে অভিভাবক করেন প্রকাশ্য পর্ব্বটুকুন······তাঁদের অভিরুচি অনুসারে।

বহুকষ্টে সুলেখা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করছিল, এবার সে নড়েচড়ে বসে প্রশ্ন করল: তোমাদের নায়কটীর নাম কি রে?

ভদ্র ভাষায় বল সুলেখা, নাম তাঁর সুধা রায়।

কি করেন, কোথায় থাকা হয়?

কিছুনা, আবার অনেক কিছুই। কবিতাও লেখেন, ছবিও আঁকেন, ঘোড়ায় চড়েন আবার এমন কি মাছও ধরেন।

তবে জল-পাণী ছোঁন না বোধ হয় ?

অন্তর বোধ হয় তাঁর অয়েল ক্লথের মত। জলই বল, আর কালীই বল, মজাতে তাকে পারে না বলেই মনে হয়।

বাড়ী ·····ঘর······ ?

হ্যাঁ, বাড়ী এখানে তাঁর একখানা আছে ব'লে শুনেছি, তবে সেখানেই থাকেন, না আর কোথায় থাকেন তা আমি বলতে পারি না। জনরব অনেক রাতই নাকি তাঁর রাস্তা বা ফুটপাথে কাটাতে হয়।

সুলেখা বলল : কিছু মনে ক'রনা রেবা, তোমার সঙ্গে এই ইন্দ্রনাথটীর সাক্ষাৎ এবং পরিচয় কোথায় ?

বিচারকের সামনে কাঠগড়ার আসামীর মত রেবা বলতে লাগল : তবে শোন, কেমন ক'রে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। যদিও সে আমার জীবনের প্রথম ট্রাজিডি, তবে একথা সত্যি ; সেই ট্রাজিডিই আবার আমার জীবনকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে। তোমাদের মনে আছে কিনা জানিনা...সেই রাণু রায়ের কথা।

সুলেখা ঘাড় নাড়ল। নীলিমা বলল : এত শীঘ্র ভোলাটা স্বাভাবিক নয়, যেমন অস্বাভাবিক হ'য়েছিল তার হঠাৎ-ডুব।

হেনা বলল : তার সঙ্গে তো আমরা অনেকবার বাস্কোপ গেছিরে !

রেবা বলতে লাগল : বাস্কোপ দেখা ছিল তার নেশা। সেদিন পিকচার-হাউসে প্লে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে আমার হাতটা চেপে ধরল। কিছু বুঝতে না পারলেও আমার মন সজাগ হ'য়ে উঠল। হাউস থেকে বেরিয়ে, আলোছায়াঘেরা মাঠের পাশ দিয়ে আসতে আসতে আমার মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল কিন্তু রাণুর ঔদাসীন্য আমায় দিল দমিয়ে। তাকে খুশী করবার জন্যই আমি রাজী হ'লাম ; কথা হ'ল, পরদিন আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব।

কয়েক মিনিট কেটে গেল, রেবা নীরব।

…পরদিন, তখন সন্ধ্যা। আমরা একটা 'বুসের' পাশে ব'সে। অনেক কথাই হ'ল। আমি বল্লাম রাণুকে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আর না হয়, আমাকে কিছুদিনের জন্য সময় দিতে, একবার ভেবে দেখবার জন্য। দেখলাম তাতে তার ভয়ানক আপত্তি।……হ্যাঁ, আমি তাকে গালাগাল দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, তখন তার মাঝে যে বীভৎসতা দেখেছিলাম তা পশুর, প্রেম সেখানে স্থান পেতে পারে না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি রায় সেই 'বুসের' পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।…আমি যেন বাঁচলাম।

সেদিন রায় তাকে বলেছিলেন,—আজ পর্য্যন্ত কোনও নারীকে আমি ভালবাসিনি। নারীর নারীত্ব তার সতীত্ব কি, তার মূল্য কি, তা আমি জানিনা,—জানতে ইচ্ছাও করি না, কিন্তু অন্তরের বিরুদ্ধে দেহের প্রতি তাকাতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। হ'ক না সে ক্ষণিকের, তবুও হ'ক সে ক্ষণ-জীবনের জন্য দেহ এবং অন্তর উভয়েরই। অন্তর যেমন চায় আহার, দেহও তেমি চায় আস্বাদ। উভয়ের আকাঙ্খা যেখানে এক, সৃষ্টি সেখানে সুন্দর, পবিত্র। পিপাসায় যখন প্রাণ যায় তখন সকল জলই পান করা যায় কিন্তু পিপাসা যখন পায় না তখন ফ্যাশান বা বিলাসের মুখ তাকালেই সেখানে আসে ব্যাভিচার। তেমনি পুরুষ হ'য়ে নারীর অন্তরই যখন পেতে পারলেন না তখন তুচ্ছ তার দেহটা নিয়ে টানাটানি করা নিছক কাপুরুষতা।

রাণু কোনও জবাব না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে স'রে পড়ল। পথে আসতে আসতে রায়ই প্রথম কথা বল্লেন। আমি তখন কি ভাবছিলাম মনে নেই। সহসা রায় বলে উঠলেন, আপনাদের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়।

আমি তাঁর মুখের পানে তাকাতে তিনি বলতে লাগলেন: অচল পথে আজ আপনারা যাত্রা করেছেন কিন্তু সঙ্গে তার যোগ্য পাথেয় কই? অন্তরকে বাসনার কষাঘাতে ক্ষিপ্ত ক'রে প্রগতির পথে ছুটিয়ে দিয়ে দেহটাকে ফেলে রেখেছেন সেই আদিম ভিত্তিতে।

আমি তো অবাক! এ কি অদ্ভুত কথা! অর্থ এর কোন পথে? ক্ষণপূর্ব্বের কথা ও ব্যবহারের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কই? তিনি বলতে লাগলেন: পাপ পুণ্য মনের বিকার মাত্র। দুটোকেই যদি সমানভাবে গ্রহণ করতে না পারলেন তবে মনকে তৈরী করলেন কি? অন্ধকার-ভবিষ্যতের পথে ছুটতে প্রতি পদে পাবেন এমনি আঘাত সুতরাং পতন, একদিন যে কোন মুহূর্ত্তে অনিবার্য।

কি এর উত্তর দেব? আজন্মের সংস্কারকে এই কটা বছরের পুঁথিগত শিক্ষা এখনও যে দূর করতে পারেনি, সেকথা সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম।

রায় অবার প্রশ্ন করলেন: কিছু মনে করবেন না। বলতে পারেন, দেহ ও মন এ দুয়ের মাঝে কে বড়, কে ছোট?—কার ইঙ্গিৎ পালন করা মানুষের কর্ত্তব্য?

আমি বললাম: আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক ধরতে পাচ্ছিনা।

হেসে তিনি বললেন: কিছু মনে করবেন না। হয়তো আমি একটু বেহায়া হচ্ছি, সেজন্য মার্জ্জনা করবেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বললেন: দেখুন অনেক সময়েই দেখা যায়, আমাদের মন নির্ব্বিচারে ব্যাভিচার করে বেড়াচ্ছে রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-বাইরে, সর্ব্বত্র। সে কিন্তু তাতে অপবিত্র হয় না অথচ দেহ যদি একবার······

নীলিমা সমাপ্তপ্রায় কথাটা অনুমানের মাঝে টেনে নিয়ে শেষ করে দিল: হুঁ, তারপর?

রায় বললেন : তবেই দেখুন শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দিতে চাই কাকে, আর দিইই বা কাকে !

গাড়ী তখন হোষ্টেলের সামনে এসেছে। আমি নামতেই তিনি বললেন : অনেক উড়ো উপদেশ দিলাম, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা···আসি তা হ'লে···নমস্কার।

আমাকে প্রতিনমস্কারের এতটুকু সুযোগ না দিয়ে হতভাগা ট্যাক্‌সিখানা দূরে মিলিয়ে গেল। ট্যাক্‌সির দিকে চেয়ে আমার মনে জাগল একটা প্রশ্ন,—এ কোন যুগের মানুষ ? অতীতের, বর্ত্তমানের না ভবিষ্যতের ?

শুনতে শুনতে সকলেই তন্ময় হ'য়ে পড়েছিল, লীলাও। কিন্তু সেই তন্ময়-তার মাঝেও সে লক্ষ্য করল আর সেই কথাটাই শুধু ভাবতে লাগল, রায়ের সঙ্গে রেবা কি সূত্রে কি ভাবে আবদ্ধ এবং তার কাহিনী বলতে ব'সে তার সহজ সরল কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কেমন গভীর বিষণ্ণ ও তন্ময় হ'য়ে পড়ল।

সুলেখা এবার প্রশ্ন করল : সেই থেকে বুঝি প্রায়ই দেখা-শুনা বেড়ে চলেছে ?

সত্যি। মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎ ঘণ্টার সমষ্টি ধ'রেও আকর্ষণ করে। তবে প্রতিবারই পাই তার নতুন এক এক রূপের পরিচয়।

সে যাই হ'ক রেবা ! এ সব কিন্তু বেশী বাড়ানো ভাল নয়। ও-সব সংশ্রব যত পার কেটে ফেলাই ভাল।

বিনা কারণে সংশ্রব কাটতে যাওয়া মানে মানহানির দায়ে পড়া···নয় কি ?

তোমরা সব এমনি অনেক বড় বড় কথাই বল কিন্তু রাণু রায়ের পরিণতি যে সুধা রায়েও সংক্রামিত হবে না তাই বা কে বলতে পারে ?

লীলা বলল : হয়তো বা পারে, আশ্চর্য্যের নয়।

থাম্ তুই। সেই থেকে আরম্ভ হ'য়েছে 'সুধা রায়, সুধা রায়'। জ্বালাতন ! বেচারীকে এ রাতের মত ছুটি দে ; পরে আর একদিন দেখা যাবে।

কিন্তু ঘটনাটা তো শোনা হ'লনা।

সুলেখার কথায় রেবা বলল : যা হে'র কাছ থেকে শোনগে যা। আমরা সবাই তো প্রেমে প'ড়ে তলিয়ে গেছি, ওই একা ঠিক রয়েছে। বানিয়ে মানিয়ে ও-কাজ ও-ই পারবে ভাল।

রেবা ইজি চেয়ারের উপরে গাটা ছড়িয়ে দিল, আঃ…

…চিন্তিত মনেই লীলা একখানা বই টেনে নিয়ে বসেছিল। যখন সেখানা তন্দ্রার ঢুলুনিতে সশব্দে মাটীতে পড়ে গেল, তখন সে সম্বিৎ ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হ'ল, "ছুটতে পারবে এমনি করে, আমার সঙ্গে সমস্ত বাধা বিপত্তি পায়ে দলে?" বইটা টেবিলের উপর রেখে সে শুয়ে পড়ল। কিন্তু এ কি উৎকণ্ঠা! নিদ্রা কি আজ আসবে না! দু-তিনবার পাশ ফিরতেই দেখল নীলিমা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোয় তার নিটোল অধরের রেখাগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে,—আজ তার ঘুম নিল কে?

অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল : নী! নী! এই নটি-নী!

নীলিমার সাড়া নেই। অগত্যা লীলা উঠে একটা খাতা খুলে বসল। ঢং ঢং ক'রে তিনটা বাজল। খাতা বন্ধ ক'রে লীলা আবার শুয়ে পড়ল। নীলিমা তখন আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারল না। হেসে বলল : কি গো লীলাবতী! জ্যোতিষশাস্ত্র ঘেটে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলে?

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত নী তড়াং ক'রে শয্যার উপর উঠে বসল : তবে রে নটিনী!

খবর্দ্দার লী! অপমান করিসনা। আমি নটিনী হ'তে যাব কেন? তুই বুঝি নিজের একজন সঙ্গী খুঁজছিস?

জানলি কি করে? তুই তা'হলে এতক্ষণ জেগেই ছিলি? আচ্ছা মেয়ে যা' হ'ক!

কথাটা ব'লে লীলা নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশের লজ্জায় যেন কেমন হয়ে পড়ল। নীলিমা তা বুঝতে পেরে চাকাটা ঘুরিয়ে দিল: তারপর···লীলাবতী?

হেসে লীলা দৃষ্টি মেলাল: বল নটি-নী।

নটি নী মাত্র নটিনীই কিন্তু ভাই, লীলাবতী শব্দের মানেগুলো সব জানিস তো? না জানলে কাল একবার অভিধানটা দেখিস?

বলেই পাশ ফিরল, লীলাও নিরুত্তর। কিছু সময় পরে লীলা শয্যার উপর থেকেই আলোটা নিভোবার জন্য তার লীলায়িত দক্ষিণ বাহুখানি বাড়িয়ে দিল। তার দেহের ছায়া পড়ল দেওয়ালের গায়ে, যে দিকে মুখ ক'রে শুয়েছিল নী।···সহসা সে সকৌতুক-অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করতেই লীলা ঝপ্‌ ক'রে শয্যায় পড়ে র‍্যাগটা টেনে দিল।

অমন করে তাকাচ্ছিস যে?

দেখছি··

নে, নে, দুষ্টমি করিস নে, ঘুমো।

ঘুমোচ্ছি, কিন্তু আমাকে নিয়ে তখন ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল কেন?

আচ্ছা! শোন একটা কথা।

বলেই সে নীলিমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। তারপর নীচু স্বরে বলল: রে-দি মাষ্টার রায়কে ভালবাসে···জানিস?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নীলিমা বলল: বটে! তা তো জানি না!···তা, এ গোটা সংসারে অনেকেই অনেককে ভাল বাসছে; তাতে তোর আমার কি? ···আচ্ছা তুই কাকে ভালবাসিস?

এখনও ঠিক বাসছি না তবে বাসবো বাসবো কচ্ছি, সুযোগ পেলেই হয়।

গভীর বিস্ময়ে লীলা প্রশ্ন ক'রল: কাকে···রে?

অদ্ভুত এক হাসি হেসে নীলিমা উত্তর করল : তোর যে বর হবে, তাকে।

ওঃ নটি-নি! সত্যিই তুই তা হলে সতীনী!—বলতে বলতে লীলা লীলায়িত দুবাহুতে নীলিমাকে বেষ্টন করে ধরল। এমনি সময়ে বাইরে যেন পদশব্দ হ'ল। লীলা চমকে উঠল। ···কে?

তুই থাক্, আমি দেখছি। বলে নি উঠে দরজা খুলতেই দেখল বাইরে ফর্সা হয়ে গেছে। ছি ছি ছিঃ ...

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাল যেন গত-রজনীর এক মহা অপরাধের তারা যুগ্ম-আসামী। দু'জনে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, রেবা সেই ইজি চেয়ারে পড়েই ঘুমচ্ছে। সহসা লীলা একটা কাণ্ড করে বসল। রেবার সামনে হাঁটু পেতে বসে বাঁ হাতে তার গলা জড়িয়ে গেয়ে উঠল :

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো"

নীলিমা বলল : আহা-হা! বেচারী বোধ হয় এখানে পড়েই রাত কাটাল রে!

লীলা বলল : তবু ঘুমিয়ে, আমাদের মত জেগে নিশ্চয়ই নয়।

রেবা চোখ তাকাতেই দেখে এই ব্যাপার। এ কি রে!

মৃদু হেসে লীলা বলল : মহারাজ্ঞী! আমার পুরস্কার?

ওঃ—ব'লে মহারাজ্ঞী সখীকে ভুজবন্ধনে বেষ্টন ক'রে তার ললাটে পুরস্কার দিল।

Just take the start of the day,
My sweet, Oh my darling!
Have peace in mind, be happy and gay.

---

## ইঙ্গিৎ

মানুষের চিরন্তন স্বভাব যে কথা বলার জন্য, যে কাজ করার জন্য, সে উদ্গ্রীব হয়—আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হ'লেই আর তার সে উদ্যম থাকে না, তার ঈপ্সিত কার্য্যে আসে শৈথিল্য, বক্তব্য র'য়ে যায় অব্যক্ত। এ যেন মানুষের ধর্ম্ম বিশেষ।

হেনা তো বলার জন্য আকুলিবিকুলি করছিল কিন্তু রেবার কাছে আমোল না পেয়ে সুলেখা যখন তারই শরণ নিল তখন সে তার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাকে মুহূর্ত্তেই সংযত ক'রে সুলেখাকে নিয়েই খেলা সুরু করল। অবশ্য এ খেলার মাঝেও একটা ইতিহাস আছে, বেশ সরস এবং রহস্যময়।

সুলেখা হোষ্টেলে এসেছে খুব বেশী দিন নয় কিন্তু এরই মধ্যে সকলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব এমন জমাট বেঁধেছে যে নূতনের সে ব্যবধান আজ আর খুঁজেও পাওয়া যায় না। সে বেশ সরলও বটে। ত্রিসংসারে তার কেউ নাই শুনেই মেয়েরা আপনা হ'তেই তার কাছে এগিয়ে এসেছিল, তারপর, মুহূর্ত্তেই যুগান্তরের ঘনিষ্ঠতা কেমন ক'রে যে সব একাকার ক'রে দিল; সুলেখার এতদিনের স্নেহ-বুভুক্ষিত অন্তর অনেক ভেবেও তা বুঝতে পারল না। সে শুধু বুঝল, এরা তার বন্ধু।

এ নিবিড় বন্ধুত্বের সুযোগ দিল সুলেখার বিবাহের অনন্ত সম্ভাবনা। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই তখন এক সূত্রে ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে—পাত্র

# ইঙ্গিৎ

বিজন বোসের বন্ধু পিনাক রায়ের সাহচর্য্যে ও সুলেখার একমাত্র অভিভাবক মিশনারী সাহেব ফাদার ওথের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিজন বোস, পিনাক রায় এবং সুলেখা তিন জনই ফাদার ওথের ছাত্র (ক্রিশ্চান নয়, অবশ্য আচারে ব্যাবহারে যা পরিচয় পাওয়া যায়)।

বিজন এবং সুলেখা যখন পিনাককে মধ্যস্থ রেখে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণে ব্যস্ত তখন হোষ্টেলের সহবাসিনীরা মনে মনে সুলেখার পাশে নিজেদের অবস্থা এবং অস্তিত্বের একটা খসড়া সমালোচনা করছিল কিনা কে জানে, তবে তাদের প্রকাশ্য আলাপ আলোচনায় [illegible] তখন [illegible]। ঠিক এমনি সময়েই সেখানে এসে পড়ল এক খবর যার অতর্কিত কামানের গোলার মত।

এতদিন ধরে সুলেখা যে সব বিশিষ্ট বিশেষণ এবং অভিভাষণ বন্ধুদের নিকট হ'তে পেয়ে আসছে তা শুধু [illegible] সুযোগ পেলেও চুপ ক'রে থাকবার মত বোবা মেয়ে বিংশ শতাব্দীতে কেউ নয়, সুলেখাও নয়। [illegible] কাছ থেকে অনেক ক'রে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা সে শুনে নিল। সুলেখার মত নেপথ্যে অনেকেই যে আছেন তা বেশ বুঝতে পারছি তাই যতটা সম্ভব সেদিনের সেই লেক-লীলার বর্ণনা সুরু হ'ল।

এই রবিবারের লেক। এখানে বিকালের শীতলতা ভোগ করা একটা বিলাস,—'এরিস্টোক্র্যাসি।'

বিডন ষ্ট্রীটের মোড় থেকে দোতলা বাসে চেপে এতটা রাস্তা আসা,—বাপ্! ঝাঁকানিতে ঝাঁকানিতে কেমন যে লাগে! তার উপর আবার পাগলা হাওয়া কী কাণ্ডটাই না করে চুল নিয়ে, আঁচল নিয়ে,—সিরিয়াস্!

রক্ত-চাঁপা রঙ জনবহুল পথ অতিক্রমে হ'য়ে ওঠে আরও রক্তাভ; কপালে, কপোলে ফুটে ওঠে স্বেদবারি যেন মুক্তা কণা। বড় নারিকেল গাছ দুটোর পাশে এসেই চটাপট চটিগুলো সব খুলে ফেলে ঝুপ ঝাপ সকলেই ব'সে পড়ে লেকের পাড়ে।

লীলা আজ যে সাড়ীখানা প'রে এসেছে তার রঙ নিয়েই প্রথম কথা উঠল। ফিল্ম-ষ্টাইলে হাত দু'খানি ঘুরিয়ে ঘাসের উপর রুমালখানি বিছিয়ে নিতে নিতে আড় চোখেই রেবা বল্‌ল: বেশ তো কাপড়খানা লী! কি রঙ রে?

এ যুগে, এ বয়সের মেয়েদের সোজা কথা বলা হয়তো বা স্‌টাইল বিরুদ্ধই, তাই লীলা উত্তর করল: বাঃ! তোমার চোখ দুটো তো এ চোখের চেয়ে ছোট নয়, দৃষ্টিহীনও নয়; দেখতেই পাচ্ছ।

ততক্ষণে সকলেই সুরু করেছে তার আঁচল নিয়ে টানাটানি।

কেউ বলছে: ডীপ্-ব্লু।

কেউ বল'লে, না, ডীপ্ তো নয়ই। লাইট যে তাতে সন্দেহই নেই, তবে কিনা···

অপর একজন বলে উঠল: নারে না! এযে ব্লু-ই নয়। দেখি···

ব'লেই সে লীলার আঁচলখানি ধ'রে বেশ একটু জোরেই টান দিল। বিরক্তি না আর কিছু বোঝা গেল না, লীর মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য লাল হ'য়ে উঠল। পর মুহূর্ত্তেই চোখা-হাসি হেসে সে বলে উঠল: বাঃ রে! তোমরা বুঝি সব এম্নি ক'রে দেখতে চাও?

হেসে রেবা উত্তর করল: দোষ কি? সৌন্দর্য্য চিরদিনই পবিত্র।

পাশ থেকে হেনা ব'লে উঠল:—তায়, কবিদের মতে নগ্ন সৌন্দর্য্য······

এমনি সময় নীলিমার কথায় সকলে অদূরে তাকিয়ে দেখল হাতে হাতে ধ'রে চলেছে কয়েকটা মেয়ে। পরিধানে তা'দের একই রঙের সাড়ী, ব্লাউজ। পায়ে একই রকমের স্যাণ্ডাল। কেরাণী পিতার অস্বচ্ছলতার নিদর্শন না

স্টাইল জানিনা—হাতে একগাছি ক'রে মাত্র সরু 'গোল্ড ব্যাণ্ড্'। সকলেরই চূর্ণ কুন্তল পাল্লা দিয়ে গিয়ে কটি-চুম্বনের অধীরতায় পুলক-চঞ্চল। উতলা বাতাস এসে দিচ্ছে তাদের দুলিয়ে,—এদিক ওদিক ছড়িয়ে।

সিরিয়াস! সিরিয়াস!—হেনা বলতে লাগল: সত্যিই, সুলেখা যা বলে তা কিন্তু মোটেই মিছে নয়। তোরা সব মেয়েগুলো সংসারে এসেছিস কি শুধু 'এক্সিডেন্ট' করতে? ওঃ! ট্রাজিডি···একেবারে যাকে বলে বিউটিফুল ট্রাজিডি······

হেনার কথার মাঝখানে রেবা হাত তুলে দূরের পানে কাকে যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘষ্ ক'রে একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। সকলেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলে: কে রে, রে?

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু······সুধা রায়। কেন, ওঁর সেই 'চুম্বন', এরি মধ্যে ভুলে গেলি? সেই অমর প্রেম?—'মরিয়া অমর হব তোমার প্রেমেতে?'

হেনা বলল: বেশ মোটরখানা কিন্তু। একবার পরখ করা যাবে না, রে? ···কাকে?

ইতিমধ্যে সুধা রায় মোটর থেকে বেরোল, তার ঢিলা পাঞ্জাবীর আস্তিন গোটাতে গোটাতে। রেবা ভিন্ন অন্যান্য মেয়েরা একটু দূরে স'রে দাঁড়াল তবে কয়েকটী ইন্দ্রিয়কে সজাগ এবং সতর্ক ক'রে।

স্মিত হাসির সঙ্গে রেবা তার বন্ধুকে অভ্যর্থনা করল। (রায়কে আস্তিন গোটাতে দেখে) পরে বলল: ওকি, কি করছেন রায়? আস্তিন গোটাচ্ছেন কেন? ভয় করছে যে!

ভয়! কার কাছে ··আপনার?—বলেই সুধা রায় হো হো শব্দে হেসে উঠল। সহসা সে হাসির বেগ থামিয়ে কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল: না, ভয় আশঙ্কার কিছু নেই। 'ওয়ার' ফেরতা ব'লেই আমি রক্ত-লোলুপ জানোয়ার নই।—তায়, দলে আপনারা অনেক আমি একা।

বিব্রত হয়েই রেবা বল্‌ল : কি বিপদ ! বলছিলাম···আস্তিন গোটাচ্ছেন কেন ?

ওঃ···এই কথা !

হাসতে হাসতেই সুধা রায় জবাব করল : নমস্কার করব না হাত-নাড়া দেব তাই ভাবছিলাম।

হাত-নাড়া কি ?

বুঝতে পারলেন না দেখছি। বেশ, আপনাদের বোধ্য ভাষাতেই বল্‌ছি। যাকে বলেন আপনারা 'হ্যাণ্ড সেক', তাকেই আমি বলি 'হাত-নাড়া'। বোধ হয় তর্জ্জমাটা ঠিকই হয়েছে···কি বলেন ?

এতগুলি বন্ধুর সামনে রায়ের এ-আঘাত রেবার বুকে একটুখানি লজ্জা এবং অভিমানও জাগাল। অবস্থাটা সরল ক'রে নেবার চেষ্টায় সে প্রশ্ন করল : তারপর, কেমন লাগছে আজ ?

রায় কিন্তু সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না। রেবার কথায় সে আগের সুরেই উত্তর করল : আপনাকে আমার কোন দিনই তো তেমন মন্দ লাগেনি।

মুহূর্ত্তে রেবার সমস্ত গণ্ড এবং গ্রীবা আরক্ত হ'য়ে উঠল তবুও সে নিজের সত্যরূপ লুকিয়ে রাখবার চেষ্টায় যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠেই বল্‌ল : আঃ ! কি মুস্কিলেই পড়লাম আপনাকে নিয়ে ! আমি কি আমার কথা বলছি ?

ওঃ ! এঁদের কথা বুঝি ?—ব'লেই চকিতে রায় একবার সকলের মুখের উপর দিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে রেবার সান্নিধ্যে এগিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বল্‌ল : আপনাকে হামেশা দেখছি, এক রকম বন্ধুত্বের সম্বন্ধ এসে গিয়েছে আপনার সঙ্গে, তাই আপনাকে যা খুশী তাই-ই বল্‌তে পারি কিন্তু এঁদের কথা কি করে বলি বলুন ?

সুধার এ কথায় রেবা যে খুশী হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাশে লক্ষ্য ক'রে রায় বল্‌ল : তবে হ্যাঁ, 'ইন্‌ট্রোডাকসন্‌' দেখে নেহাৎ মন্দ লাগছে না।

মেয়েরা যে ভাবে হাসে এসব ক্ষেত্রে, ঠিক তেমনি ভাবেই হেসে রেবা বলল : অবাক করলেন আপনি! কোথায় আবার আপনাদের ইন্‌ট্রোডাকৃসন হ'ল ?

( নিম্নস্বরে অথচ রায়ের কাণে কথাটা যায় এমনিভাবে ) লীলা রেবাকে বলল : সত্যিই···রে-দি'র এ বড় অন্যায় হচ্ছে।

সুধাও এ-সুযোগ নষ্ট ক'রলনা। লীলার কথার সূত্র ধ'রে সে বলল : সত্যিই, আপনাদের নির্ব্বাসনে রেখে আপনাদের বন্ধুকে ছিনিয়ে নিয়ে···না না, এ নেহাৎ স্বার্থপরের মত কাজ হ'য়েছে আমার। আপনারা আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন।

সুধা রায় হাত যোড় করতেই সকলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। 'না না···কি বলছেন আপনি! সে কি!' এরকমের অস্ফুট কয়েকটা কথা সকলের মুখ থেকেই বেরিয়ে প'ড়ল।

রায় বলল : না, আপনারা এসেছেন সকলে মন খুলে কথা ব'লবেন, একটু বেড়াবেন···এই জন্যেই তো ? নইলে এখানে লোকে কি ক'রতেই বা আসে, বলুন ? অন্ততঃ, আমি তো এই বুঝি।

সুধা রায়ের কথা শেষ হবার আগেই লীলা আচমকা প্রশ্ন ক'রে বসল : প্রায় বার পঁচিশেক তো হ'ল লেকটা রাউণ্ড করলেন দেখলাম, কেমন লাগল ?

কেমন একটা স্বপ্নজড়ানো ভাষায় অথচ মোলায়েম কণ্ঠে রায় উত্তর করল : আপনাদের কাছ থেকে এম্নি প্রশ্ন এলেই কি জানি কেন আমার কথাগুলো জড়িয়ে যেতে চায়। আপনারা শুনলে হয় তো বলবেন, ও কবিতা !

রেবা বলল : তা শুনিই না। কবিতা আর এমন মন্দ কি !

কথাটা কি জানেন ? এই ধরুন পৃথিবী, ও-যে কত কাল ধ'রে ঐ সূর্য্যের লোভে তার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; অবশ্য প্রাপ্তি একদিন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ওর ক্লান্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। কেমন যে লাগছে

কেউ বলতে পারে না, ও নিজেই পারে না আজ ; হয় তো পারবে সে-দিন, যে-দিন ও তার নাগাল পাবে।

রেবা প্রশ্ন করল : কিন্তু সে কি হবে কখনও ?

রায় একটুখানি হাসল মাত্র। লীলা তা'র দিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত ভাবেই বলল : না, আমি আপনার ঐ গাড়ীখানা দেখেই বুঝলাম।

কি মুস্কিল ! আমি কি বলছি, আপনি আমাকে দেখে বলছেন ? কিন্তু যা-ই বলুন আপনি, গাড়ী বা তার নাম্বার লক্ষ্য করা তা হ'লে শুধু ছেলেদেরই একচেটে নয় ? ব'লে, রায় হো হো শব্দে হেসে উঠল। লীলা লজ্জিত স্তম্ভিত হ'য়ে মুখ নীচু করল।

রেবা বন্ধুর অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারল। তাই এ আলোচনা ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে নেবার জন্য বলল : মেয়েদের আপনি যাই বলুন না কেন রায়, রাগাতে আমাদের পারবেন না কোন দিন।

হেসেই রায় উত্তর করল :—রাগ শব্দের যে অর্থ অভিধানে আছে তা' যে কখন কি ভাবে আপনাদের মাঝে প্রকাশ পায়…তা বোঝা সত্যিই কঠিন, বিশেষ ক'রে আমার।

থাক্ বুঝেছি। কথায় আপনার সঙ্গে পেরে উঠব না জানি। এবার চলুন তো একটু বেড়ান যাক্।

রেবার প্রস্তাবে রায় সকলের মুখের পানে একবার ক'রে তাকিয়ে বলল : আসুন, গাড়ীটা যখন রয়েছেই।

সকলে কথা ব'লতে ব'লতে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেই লছমন নিচে নেমে দাঁড়াল।

হেনার হাত ধ'রে একরকম ঠেলেই তাকে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিতে দিতে রেবা বলল : তুই-ই আগে ওঠ। মোটর দেখে অবধি তোর গাটা যে কেমন ক'রছে জানি।

আঃ! ব'লে হেনা তাকে থামিয়ে দিল। নীলিমাকে লক্ষ্য ক'রে সুধা রেবাকে বলল: এঁকে যেন আপনার দলে ঠিক মানায় না, কি বলো? ব'লে সে নীলিমার পানে তাকাল। নীলিমার কিন্তু কোনও রূপ চাঞ্চল্য নেই, মৃদু হাসির সঙ্গে সে মোটরে উঠে রেবার পাশে ব'সতেই সে বলে উঠল: লী-কে আপনার সিটে নিতে হবে, আর 'স্পেশ' নেই।

রেবার কথায় রায় পেছনে ফিরে তাকাতেই লীলার লাজ-নম্র বিশাল আঁখি দুটী ক্ষণিকের জন্য তাকে স্তব্ধ করে দিল। কোনও কথা না ব'লে সে গাড়ীতে উঠল, তারপর লীলার পানে তাকিয়ে বলল: আসুন। কুণ্ঠিত সরমে লীলা এসে রায়ের পাশে বসল, গাড়ী 'ষ্টার্ট' দিল।

............মুহূর্ত্তে গাড়ীর গতি দ্রুততর হ'তে থাকল। কারো কথাই কেউ আর শুনতে পাচ্ছে না; ক্রমে বাইরের শব্দও মৃদু হ'য়ে তারপর ম'রে গেল। লীলার মনে হচ্ছিল বুঝি তারা মর্ত্ত্যের মায়া ছেড়ে কোথায়ো ছুটে চলেছে। প্রকৃতিস্থ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল।

ক' মিনিট? ওঃ! ক'বার রাউণ্ড দিলেন মিঃ...

লীলার কথা শেষ হল না, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লীলার পানে তাকিয়ে রায় ব'লে উঠল: ভুল করবেন না মিস্, মিষ্টার আমি নই...আমি মাষ্টার...

কিন্তু আস্তে, আর একটু আস্তে মাষ্টার রায়; এ আমি সইতে পারছি না।

প্রতিকূল বায়ুর প্রচণ্ড গতিশীলতায় লীলার কথা রায়ের কাণে প্রবেশ করল কিনা বোঝা গেলনা কিন্তু মোটরের গতি দ্রুততর হ'ল। রায় নীরব, দৃঢ়ভাবে ষ্টিয়ারিঙ ধরে; দৃষ্টি তার সম্মুখের পানে স্থির নিবদ্ধ। পাশে বসে লীলার মন মোটরের এই অস্বাভাবিক দ্রুতগতির তালে তালে যেন কেমন হ'য়ে গেল। উত্তাল হাওয়া তার আলুলায়িত কেশরাশিকে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল উভয়ের চোখে মুখে কিন্তু তা সংযত করবার শক্তি তখন লীলার

নাই। লীলার মনে হ'ল, যদি সে একটুও ন'ড়ে বসে বা তার চেষ্টা মাত্র করে তবে তার ফল যা হবে তা শোভন নয়।

লেকের সমস্ত লোক বিস্ময়াবিষ্ট। সকলেই লক্ষ্য করছে এই গাড়ীখানা।

নম্বর, নম্বর কত হে?

তা কি ছাই দেখা যাচ্ছে!

তবে সাহেব নিশ্চয়ই, বাঙালীর এ বুকের পাটা হবেনা বাপু!

চারিদিকে আরম্ভ হ'ল এমন আলোচনা ও অদ্ভুত ধরণের অভিমত।

পেছনে মোটর সাইকেলে একটা সার্জেণ্টকেও ছুটতে দেখে সকলেই স্থিরসিদ্ধান্ত ক'রে নিল যে এ নিশ্চয়ই কোন পলিটিকাল কেস্।

মোটরের মধ্যে তখন নেমে এসেছে একটা স্বপ্নের মাদকতা। উতলা হাওয়ার প্রতিকূলতায় লীলার অন্তরে বহুক্ষণ ধ'রে জেগেছিল একটা মাতন যা তাকে আত্মহারা করে নি; ক্রমে সে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল।

আঃ! থামুন মাষ্টার রায়! এ কি কেলেঙ্কারী করছেন বলুন তো?

সে কথা কাণে না তুলেই আবেগভরা স্বরে রায় বলল: পারবেন এম্নি ভাবে আমার সঙ্গে ছুটতে সমস্ত বাধা বিপত্তি পায়ে দলে'? পারবেন আমার সঙ্গে সমান তালে চ'লতে?

সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ এড়িয়ে লীলা তার সুগোল বাহু দিয়ে রায়ের পেশীবহুল হাত দুটী জড়িয়ে ধ'রে মরিয়া হ'য়ে বলল: আপনার হাতে ধরছি মাষ্টার রায়, ফিরুন। এ যে ধ্বংসের পথ!

রায়ের সমস্ত শক্তি এবং জিদ মুহূর্ত্তেই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ষ্টিয়ারিঙ ছেড়ে দিয়ে সেও লীলার হাত দু'খানি আঁকড়ে ধ'রে বলল: মৃত্যুর কোলে দাঁড়িয়ে জীবনের যে অনুভূতি সে কি ধ্বংস হ'তে পারে লীলা! সেই তো জীবনের পরিপূর্ণতা!

এতক্ষণে সার্জেন্ট এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। চকিতে মেয়েদের মানস-চক্ষে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের মূর্ত্তিখানা স্পষ্ট ভেসে উঠল। সময় সম্বন্ধে হ'ল তারা সজাগ—চঞ্চল !

তাইতো ! ক'টা বাজে ?

রেবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তখনও সন্ধ্যা হয় নি।

গাড়ী থেমে যেতেই লীলা তার সম্বিৎ ফিরে পেল এবং দেবী জানকীর মত 'বসুন্ধরা ! তুমি আমায় গ্রহণ কর', বলেছিল কিনা জানিনা তবে সুধা রায় পলকের মধ্যেই ঘুরে বসে ষ্টিয়ারিঙ ধরল। কিন্তু হায়, গাড়ী অচল !

বিপুল জনতা ততক্ষণে মোটরখানিকে ঘিরে ফেলেছে। কেউ বলছে খুনী, কেউ বলছে মাতাল। সুধা রায় ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বলে উঠল : কি হচ্ছে, রাস্তা ছাড়।

শ্লেষের সঙ্গে একটা কণ্ঠ ব'লে উঠল : আর রাস্তা এখানে কোথায় দাদা ! এ যে সরোবরে এসে পৌঁছে গেছ, রাস্তা যে এখন লালবাজারের পথে ! মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কি কাণ্ডটা হ'য়ে গেছে রায় তার কিছুই বুঝতে পারেনি। তাই অপরিচিতের এই ধৃষ্টতায় সে রাগ ক'রে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। সার্জেন্ট ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এসে তার সামনে দাঁড়াল, কিন্তু আসামীর মুখের পানে তাকিয়ে তার মুখে বিস্ময় ও আনন্দের দীপ্তি ভেসে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে সে আসামীকে জড়িয়ে ধরল : হ্যালো রয় ! তুমি !

সুধা রায় অপ্রস্তুত, বিস্মিত। নিমিসেই অবস্থাটা সে বুঝতে পারল। আর তাকে চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরল : কাপ্তেন হিল্‌ ! তুমি ! তুমি 'ইন্‌ডিয়ায়' ?

হেসে সাহেব উত্তর করল : হ্যাঁ, কিন্তু তোমার যে দেখছি এখনও সেই 'ফক্কের' স্বভাব। এ করেছ কি ? এরা কারা ?—ব'লে মোটরের দিকে লক্ষ্য ক'রল।

হেসে রায় উত্তর করল : ওঃ, আমার ফ্রেণ্ড্স্ !

এই সুধারায় ও কাপ্তেন হিল্ কতবার এক সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কতলোকের প্রাণ নিয়েছে, কতবার প্রাণ দেবার আয়োজন করেছে। এক সঙ্গে সে কত দিন, কত রাত, কত কথা। বহুদিন পরে আবার এই দেখা। কাপ্তেন সঙ্গে নিতে চাইল রায়কে, দু'জনে আজ এক সঙ্গে টিফিন করবে, রায় সম্মত হ'ল।

একটা ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছিল, ইঙ্গিতে তাকে থামাতেই কাপ্তেন বল্ল : আমার তো 'সাইড্ কার্' ছিল রায়।

হেসে রায় উত্তর করল : But it is for my luggage...living of course. পরে মেয়েদের পানে তাকিয়ে বল্ল : এই আপনাদের ট্যাক্সি এসেছে। তারপর মোটারের দরজা খুলে দিতেই একে একে মেয়েরা সকলে ট্যাক্সিতে উঠে বসল, কিন্তু কেউ আর কোনও কথা বল্ল না যখন, তখন রায় দু' হাত কপালে স্পর্শ ক'রে তাদের নমস্কার করেই বলে উঠল : নমস্কার। Sorry, Good-bye—to my moment's friends. Good-bye.

মেয়েরা তখনও নীরব। সুধারায় ছুটে গিয়ে পাশে ব'সতেই ভট্ ভট্ শব্দ ক'রে মোটর সাইকেল খানা মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদৃশ্য হ'ল।

বিস্ময়-স্তব্ধ জনতাকে কল্পনা এবং আলোচনার পরম রমণীয় সুযোগ দিয়ে ট্যাক্সিখানাও অদৃশ্য হল।

সন্ধ্যা তখন নেমে আসছে ম্লান মধুর। হ্রদের বুকে আকাশের লালিমার মায়া-ছায়া ক্রমে গভীর কালো হ'তে লাগল। রাজধানীর সীমার বাইরে বুঝি সব সংস্কারমনা পল্লী হ'তে শঙ্খধ্বনি ভেসে এল। লেকের ওপারে কার মর্ম্মন্তুদ সুর ঝঙ্কার দিচ্ছে :

সন্ধ্যা হ'ল আলো আলো
ওমা তোমার নয়ন কোণে—

রবিবার। সাত দিনের মধ্যে 'রবিবার' একটা দিন···আর ছ'দিনের মত। আর ছ'দিনেরই মত? নিশ্চয়ই না। ওঃ! সেই একটা মাত্র দিন, রবিবার; কোথা হ'তে কেমন ক'রে এসে তার জীবনের পথে আত্মপ্রকাশ করল এই রূপ নিয়ে! অন্তরের অজানিত, অচিন্তিত কতগুলি বৃত্তিকে অনির্ব্বচনীয় এক আনন্দ স্পর্শে উজ্জীবিত ক'রে দিয়ে গেল তার দুঃসহ দৃপ্ততায়।—নইলে অনেক রবিবারই তো তার জীবনের খাতায় খরচ হ'য়ে গিয়েছে তারও অগোচরে কিন্তু সেই রবিবার?—সে যে তার জমার ঘরেও অনেক কিছু জমিয়ে রেখে নিঃশেষে শেষ হ'য়ে গেল।

এ সঞ্চয়ের বেদনা যে এতো মর্ম্মান্তিক তা' তো লীলা কোনও দিনই ভাবতে পারেনি। নিছক যে ব্যথা,—যে ব্যথা শুধু যন্ত্রণাই দেয়···সে যন্ত্রণা যতো কঠোর, যতো নিদারুণই হ'কনা···তবুও সে ভাল।···সে সহজ সরল এবং সত্য সত্যই সে ব্যথা, বেদনা···যন্ত্রণা,···তার সঙ্গে সুখ-শান্তির সৌহার্দ্দ কোনও দিনই কেউ কামনা করে না। কিন্তু এ ব্যথা সে ব্যথার চেয়েও করুণ, বেদনার চেয়েও মর্ম্মান্তিক··যন্ত্রণার চেয়েও নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! কিন্তু সত্যই কি তাই?

একে সহ্য করা যতো কঠিনই হ'কনা উপেক্ষা করা যে আরও কঠিন আরও ভীষণ! না, না না!—সে তা চায় না···বিস্মৃতির সে স্মৃতিকে সে পারবে না কোন দিনই বরণ করতে!—

লীলা শুধুই চিন্তা করে। তার এই চিন্তাসমুদ্রে কূল নাই, কিনারা নাই,

আছে শুধু স্রোত, ঢেউ; উত্তাল, ফেনিল। লীলার মনে হ'ল, যৌবনই জীবনের পরম শত্রু। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তার সুধা রায়ের কবিতা 'যৌবনবোধন'।

টেবিলের উপর থেকে বইখানি নিয়ে সে খুলে বসে। খানিকটা প'ড়ে বই বন্ধ ক'রে সে আবার ভাবতে আরম্ভ করে। কবিতা কি? এ যে তারই অন্তরের মত বিচিত্র, হেঁয়ালীময়। বাণী তার সহজ সরল, অর্থ তার গভীর রহস্যভরা। সে যা বলে, তা যেন তার ঐ বলাতেই শেষ হয় না, আরও কিছু, আরও অনেক কিছু; গভীর অর্থ ও ভাব মানুষের চিন্তা ও বিচারশক্তির অপেক্ষায় থাকে। চিন্তাশক্তি যার প্রখর ও ব্যাপক, জ্ঞান যার গভীর, বুদ্ধি যার তীক্ষ্ণ এবং অন্তর যার স্বচ্ছ; একমাত্র সে-ই হয় তো পারে পরিপূর্ণ ভাবে এই কাব্য উপভোগ ক'রতে।

এই ক'মাস ধ'রে ক্রমাগত কবিতা পড়ে' পড়ে' লীলার ধারণা হ'য়েছে হয় তো আরও কিছুকাল যদি সে এমনি ক'রে কবিতা পড়ে তবে সে পাগল হ'য়ে যাবে।

নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তা ক'রতে ক'রতে এক সময়ে তার ভাবান্তর হ'ল। মুখখানি যেন সহসা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল, সামনের আর্শিখানা তার ছায়া ধরল। সেদিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল,—তার এই দেহ, নিটোল সুন্দর এলায়িত এই বাহু, সরল-সরু এই গ্রীবা, আকর্ণ বিস্তৃত কালো দু'টী চোখ, এমন সঘন কালো ভ্রূ, সরল নাস, অনন্ত আকাশের কোলে একটী মাত্র নক্ষত্রের মত শুভ্র গণ্ডের এই তিলটী, ডালিম ফুলের পাপড়ির মত এই পেলব অধর, এ-সব কি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? আবার ভাবে, না, সে নিজেই নিজেকে এতোটা সুন্দর দেখছে, নইলে প্রকৃতই সে হয়তো ততোটা সুন্দর নয়। আবার সে একটীর পর একটী ক'রে পায়ের নখ থেকে দেখতে সুরু করে, ক্রমে তার অন্তরের অমীমাংসিত প্রশ্ন তার মাথার কালো কেশের সহস্র ধারার মাঝে মিলিয়ে যায় বহুমুখী হ'য়ে।

না, মানুষ অন্ধ, দৃষ্টি শক্তি তার ক্ষীণ। আবার মনে হয়, অজস্র জনস্রোতের মাঝে একটিমাত্র মানুষকে বিশেষরূপে বিচার ক'রে, সূক্ষ্মভাবে তন্ন তন্ন ক'রে দেখবার সুযোগ পায় কৈ? নইলে—, কই? ইচ্ছা থাকলেও তো সে পারেনি সুধা রায়ের মুখের পানে একবারও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে। কিন্তু একটা কথা। সে যেমন এখন রায়ের কথা চিন্তা করছে রায়ও কি তেমনি লীলার কথা ভাবছেন? ভাবে কি কেউ? আর একটা কথা মনে হ'তেই লীলা অন্তরে অন্তরে রাঙিয়ে উঠল।

"পারবেন এমনি ভাবে আমার সঙ্গে ছুটতে সমস্ত বাধা বিপত্তি পায়ে দলে?—পারবেন আমার সঙ্গে সমান তালে চলতে?"

লীলা ভাবে এ কথার অর্থ কি? রায়ের প্রত্যেক কথাটী লীলার মনে হ'তে লাগল যেন একটা অদ্ভুত শক্তি ও মাদকতা মাখানো।

তারপর, তার দু'টী হাত নিজের মুষ্টি মধ্যে নিয়ে রায়ের সেই কথা, "মৃত্যুর কোলে দাঁড়িয়ে জীবনের যে অনুভূতি সে কি ধ্বংস হ'তে পারে লীলা! সেই তো জীবনের পরিপূর্ণতা!"

একথা ভাবতেও লীলার দেহ-মনে জাগে একটা আনন্দের বিপ্লব। লীলা! লীলা! রায় তাকে লীলা ব'লে সম্বোধন করল কেন? এর অর্থ কি? আর মৃত্যুর মাঝে যে অনুভূতিকে সে জীবনের পরিপূর্ণতা ব'লে বরণ করল সেটাই বা কি?—সে কি তারই স্পর্শ?

লীলার মাথার ভিতর যেন কেমন ক'রে ওঠে, সে আর ভাবতে পারে না। সেদিনের, সেই দুই মাস পূর্ব্বের একটী মাত্র রবিবারের স্মৃতি আজও তাকে ক'রে তোলে বিচলিত, সমস্ত দেহ-মনে জাগে তার অপূর্ব্ব এক পুলক-শিহরণ। প্রথম-পুরুষ-স্পর্শের এ-কী উগ্র মধু জ্বালা—!

দু'হাতে মুখ ঢেকে লীলা টেবিলের উপর মাথা রাখে।

'হোষ্টেল' তারা ছেড়ে দিয়েছে এবং এখন যেখানে বাস ক'রছে এটাকে 'মেস' বলা যেতে পারে। 'হোষ্টেল' ছাড়ার কারণ অনেক। তবে বিশেষ কারণ 'চিরন্তনী সভা'।

'চিরন্তনী সভার' ইতিহাস বলতে হ'লে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে সুধা রায়ের কতগুলি খণ্ড ছিন্ন চিন্তা নিয়ে রেবা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ করে। নারীর চিরন্তন অধিকারের দাবীই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। সভাপতি এবং তাঁর সহকারিণী যথাক্রমে বিজন বোস এবং তার স্ত্রী সুলেখা বোস। এরূপ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন, তা কেবল বিজন বোসই পারে দান করতে। তাই অনেক চিন্তার পর রেবা তাকেই সভাপতি করল নইলে প্রতিক্ষণ তার মনে জাগছিল সুধা রায়েরই কথা।

বহুদিন সুধার সঙ্গে রেবার দেখা হয় না। রেবা তার হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল সেখানে অন্য সব ভাড়াটে বাস করছে। তারা সুধারায়ের কোন সন্ধানই দিতে পারল না। এমনি সময় হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেন্‌ড্যান্ট তাদের বিপক্ষে দাঁড়াতেই একযোগে তারা বেরিয়ে এসে এই মেস ক'রে বাস করতে লাগল।

যা' হ'ক 'চিরন্তনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং তার সদস্য সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এখন রেবার ইচ্ছা সুধা রায়কে সভাপতি ক'রে সভার একটা বিশেষ অধিবেশন করা। নীলিমাকে সেই উদ্দেশ্যে সুলেখার

বাড়ীতে পাঠিয়ে রেবা বসে চিরন্তনীর কাগজপত্র দেখছিল। মেয়েরা তখন কেউ ক্লাসে, কেউ কেউ নিজেদের ঘরে বই খাতায় অথবা ঘুমে বন্দী।

রেবা লীলাকে ডাকল তাকে একটু সাহায্য ক'রবার জন্য কিন্তু পাশের ঘর হ'তে লীলার কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। রেবা মনে মনেই বল্ল: সকলে যে বলে লীর বুকে পদ্মার ভাঙন লেগেছে—তা একেবারে মিছে নয়।

রেবা যখন কাগজপত্র ঘেটে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে তখন কয়েকটা দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক বগলে নিয়ে সে-ঘরে প্রবেশ ক'রল ডলি। ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার ক'রে উঠল: বিংশ শতাব্দীর সেরা সংবাদ কি জানো?

কাগজ থেকে মুখ না তুলেই রেবা বল্ল: বোধ হয় নারীদের 'চিরন্তনী সভা'।

চিরন্তনীই বটে, তবে তোমাদের এ চিরন্তনী তার কাছে অতি তুচ্ছ। বিংশ শতাব্দীর সেরা সংবাদ, শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য নারীর চিরন্তনী নয়; নারী ও নরের কাগজের মারফতে অন্তরের চিরন্তন স্রোতের মহামিলন, প্রেমের আদান প্রদান।

সেকিরে! রেবা কলম রেখে মুখ তুলে তাকাল বিস্ময়ে।

বিশ্বাস না কর প'ড়ে দেখ। ব'লে ডলি একটা কবিতা খুলে ধ'রল রেবার সামনে: তোমরা আর কি চিরন্তনী করছ, এই দেখ চিরন্তনী বলে কাকে!

রেবা দেখল সুধারায়ের একটা কবিতা, নাম 'চিরন্তনী'। গভীর আগ্রহে সে পড়তে আরম্ভ করল।

## ইঙ্গিৎ

মূর্ত্তি নাহি ছিল জানা,
নাহি ছিল ধ্যানের ধারণা,
রহস্যের পরপার হ'তে
কে গো তুমি দিলে হে প্রেরণা ?
সুপ্ত মোর চিত্ত-বৃন্তে দিলে হে চেতনা ?
চিত্তে আজ জাগে সুর
মধুর মধুর !
কল্পনায় ভাসে কার ছায়া !
কে তুমি রহস্যময়ী !
পশ্চাতে রেখেছ ঢাকি'
আপনার অদৃশ্য ও কায়া ?
তোমার কায়ার ছায়া,
আমার কাব্যের মায়া,
ধরণীর ধূলিপরে
বন্দী কি গো হবে কোনও দিন ?
তোমার আমার এই দূর ব্যবধান
হ'য়ে যাবে লীন !
হবে ?
কবে ?......সে কোন্ খনে ?
সৃষ্টির সে অন্তিম লগনে ?
বেশ ! তবে তাই হ'ক্,
তোমার আমার এই দূরত্বের মাঝে
জগতের দীর্ঘশ্বাস জমা হ'য়ে র'ক্,
—আমি রব তাহারি স্বপনে।

রেবা মুখ তুলে তাকাতেই ডলি ব'লে উঠল : কি হ'ল ! সবটা দেখই না আগে। তোমার সুধাবাবুর প্রার্থনা কি শোন !

রেবা আবার পড়ল। সৃষ্টির সে প্রথম প্রত্যূষে

সৃষ্টি-তত্ত্ব জানেনি মানুষে,

সেইদিন হ'তে আমি চলিয়াছি গাহি

স্মৃতির অন্তিম পানে চাহি

সেই মোর চিরন্তন গান,

যাহা কিছু গড়িয়াছি আমি,

হে প্রেয়সী ! মৃত্যুমাঝে তুমি তার

ক'র প্রাণদান !

কি, কেমন বুঝছ ?

ডলির কথায় রেবা ব'লল : চমৎকার ! লী'কে গিয়ে দে। বল্, এক্ষুণি এর একটা জবাব লিখে দিতে।

রেবার কথায় ডলি ব'লল: তা আর তোমায় ব'লে দিতে হবে না। এই দেখ, পড়ো দেখি। ব'লে সে আর একটা কাগজ খুলে ধ'রল।

রেবা আঁৎকে উঠল : এ্যাঁ ! এ সব কি ?

তোমাদের চিরন্তনী।

এ-ও চিরন্তনী ! আমাদের লীর-ই লেখা তো ? দেখি, দেখি।

ব'লে সে পড়ল !

—কেন সেই অজানা প্রদেশে—

পুতুল খেলায় মোরে ডেকেছিল কেন

খেয়ালীর বেশে ?

তোরা সকলেই তো কবি হ'য়ে গেলি, আমি একাই শুধু······নাঃ।

ডলি বিরক্ত হ'য়ে বল্ল : এটা শেষ ক'রে নাওনা বাপু।

তোমার নয়নালোকে প্রথম দেখেছি আমি

আমার হৃদয়,

তোমাতে দেখেছি আমি অনন্ত সে উষার উদয় !

স্পর্শ তব ডেকেছে আমারে,

সিন্ধু তাই ছুটিবারে চায় অন্তহীন বারিধি পাথারে।

কাণে কাণে কি যে বলেছিলে

আজি তব মনে নাহি হায় !

কিন্তু সেই বাণী তুলিছে রাগিণী

আজি মোর সর্ব্ব অঙ্গে, শিরায় শিরায় !

অনন্তের মুখ চাহি'

আমিও চলিব গাহি,

মোর সেই কথা।

ফুল তার সব দিয়ে মরে,

তাকে নিয়ে খেলা করে

—যে পাষাণ,···সেই কি দেবতা ?

চমৎকার, চমৎকার জবাব হ'য়েছে ! কিন্তু ও তা' হ'লে সুধাবাবুর 'চিরন্তনী' আগেই পড়েছিল ?

রেবার কথায় ডলি ব'লল : কে ? লী ? তা জানিনাতো !

এমনি সময় ঘরে এসে প্রবেশ করল অমলা, হেনা, বিনতা আরও অনেক।

হেনা বলল : নিশ্চয়ই ! ওরা দু'জনে পরামর্শ ক'রে লিখেছে।

রেবা বলল : ধ্যেৎ ! তা কি করে হবে ?

নইলে এ কি ক'রে হয় ?

হেনার কথায় রেবা ব'ল্‌ল : আমিও তাই ভাবছি। নি থাকলে ব'লতে পারত রহস্যটা কি।

রেবার এ অনুমান সত্য। সুধা রায়ের কবিতা বেরোতেই নীলিমা দেখতে পেয়ে একটা কাগজ এনে লীলাকে দেয়। পরে লীলা নীলিমার সঙ্গে পরামর্শ করে এই কবিতা লেখে।

হেনা জিজ্ঞাসা করল : নি-টা গেল কোথায় ?

সু'র বাড়ী।

তা' হ'লে এক্ষুণি ফিরবে, কি বল ?

হেনার উত্তরে রেবা বল্‌ল : নীলিমা আজ আসবে না। সু'দের পাড়ায় তার কোন্ এক বোন আছে। অনেক দিন ধ'রে সে বেচারী নেমন্তন্ন ক'রে ক'রে হয়রান হ'য়ে পড়েছে। তাই সু'দের বাড়ী হয়ে 'নি' আজ সেখানেই যাবে, আসবে কাল সকালে।

তখন সত্য ঘটনা জানবার জন্য একমাত্র রেবা ভিন্ন সকলেই ছুটল লীলার ঘরে।

হিসাবের খাতার পানে চেয়ে রেবা তখন কি ভাবছিল তা সেই ব'লতে পারে, কিন্তু হিসাব তার আর মিল্‌ল ব'লে মনে হয় না।

লীলার ঘরে যখন সকলে প্রবেশ ক'রল তখন সে টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে গিয়েছে। চুপি চুপি সকলে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। দীর্ঘ কেশরাশি ঘুরিয়ে এনে মাথার উপর আল্‌গা ক'রে জড়ানো। তারই নিম্নে সুগোল স্কন্ধের উপর কালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশের ফাঁকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে—কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ফোটে যেমন জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র।

ডলি ধীরে ধীরে তার চিবুকখানি রাখল লীলার স্কন্ধের উপর। সে স্পর্শে লীলা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই সকলে তাকে জড়িয়ে ধরল।

হেনা বলল : বাবা! সেদিন লেকে গিয়ে একেবারে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে এসেছ ?

ডলি বলে উঠল : খোয়ানো বলিস তুই কাকে হেনা ? এ সঞ্চয়। আর এ সঞ্চয় অমর। রেকর্ড রাখতে একা ও-ই পেরেছে। তোমাদের উচিৎ ওকে একদিন বাস্কোপ দেখিয়ে দেওয়া।

অপরাপর সকলে তখন লীলার খাতা খুঁজতে আরম্ভ করেছে। লীলা জিজ্ঞাসা করল : কি খুঁজছিস্ তোরা ?

চিঠি পত্র যদি কিছু থাকে, তাই খোঁজ করা হ'চ্ছে।

লীলা বল্‌ল : চিঠি দু'খানা তো আমার কাছে নাই।

রহস্যই করছিল মেয়েরা, এখন লীলার কথা শুনে বিস্ময়ে তারা অবাক্ হ'য়ে গেল। তা'দের বিদায় করবার উদ্দেশ্যে লীলা বল্‌ল : চিঠিগুলি তো রে'দির কাছে।

বটে! তাই রে গম্ভীর হ'য়ে দূরেই সরে রইল। আচ্ছা! চলো, দেখি কেমন রে'দি!

সকলে যখন দল বেঁধে ছুটল রেবার কাছে তখন লীলা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার কি হবে আশঙ্কায় সে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

পাশের ঘরে মেয়েরা তখন রেবাকে ঘিরে ধরেছে। লীলা মনে মনেই একটু হাসল মাত্র।

ইঙ্গিৎ

সুলেখার ক'প্রস্ত কাপড়, পোষাকী এবং আটপৌরো, ক'প্রস্ত গহনা এবং কোন্‌টা কোন্ জুয়েলারের তৈরি, কি তার দর, দিনে রাতে ক'বার তাকে পোষাক পালটাতে হয়, যে দিনটা মেঘলা থাকে সেদিন তাকে কোন্ রঙের সাড়ী ব্লাউজ প'রতে হয়, আবার যেদিন কড়া বা মিঠে রোদ থাকে সেদিনই বা কেমন সাড়ী প'রতে হয়, সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুলেখা নীলিমাকে ব'লে দেখাতে লাগল।

একটা সুটকেশ খুলতেই দেখা গেল শুধু রুমাল,—কতো না রকমের। নীলিমা দেখল সে সব 'ক্যালেণ্ডারের' রুমাল। অর্থাৎ গোটা বৎসরের মাস, সপ্তাহ এবং দিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখ খোদাই করা তিনশত পঁয়ষট্টি খানা রুমাল থাকে থাকে সাজানো। নীলিমা অতি কষ্টেই তার মনের অসংখ্য প্রশ্নকে থামিয়ে রাখল কারণ সুলেখা তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে ব'লে চলেছে তার নূতন সব অভিজ্ঞতার কথা।

আজকাল যতো সব ভদ্র 'সু-মেকার' হচ্ছে, তাদের নাম ধাম থেকে আরম্ভ ক'রে 'ফিরপো'তে কোন্ খাবারের কিরূপ চার্জ্জ, 'টমেটো'র কেমন স্বাদ মায় কোন্ 'ক্রিম্‌টার' কি 'ডিফেক্‌ট' কোন্ 'সেন্‌ট্‌টা' কতটা ষ্ট্রং, কোন্‌টা বা 'মাইল্‌ড্', 'ভিম্‌টোতে' কত 'পার্সেন্‌ট' 'এ্যাল্‌কোহল্' শুনতে শুনতে নীলিমা বিস্মিত বিরক্ত হ'য়ে উঠল।

এমনি সময় বিজন এসে তাকে সুলেখার কবল হ'তে উদ্ধার করল, নীলিমা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বিজন বলল: আপনাদের চিরন্তনী সম্বন্ধে আমার মতভেদ নাই, তবে অধিবেশনের তারিখটা একটু দেখেশুনে ঠিক করতে হবে, কেন না যাকে প্রেসিডেন্ট করব ভাবছি, তাঁর সুবিধা অসুবিধা দেখেই করা ঠিক···কি বলেন?

কাকে প্রেসিডেণ্ট করবেন? নীলিমা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

পিনাক রায়···উপযুক্ত লোক সন্দেহ নাই।

যদিও মেয়েদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল সুধা রায়কে প্রেসিডেণ্ট করা কিন্তু নীলিমা বিজনের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে পারল না। নেহাৎ ক্ষুণ্ণ মনে অন্যান্য কথাবার্ত্তা সব স্থির ক'রে সে সুলেখার নিকট হতে বিদায় নিল।

নীলিমার দিদির বাড়ী বেশী দূর নয়। বহুদিন পরে দু'বোনের দেখা হ'ল।

লালিমা নীলিমাকে অনুযোগ দিল: আমি না হয় সংসার নিয়ে, ডজন খানেক ছেলে মেয়ে নিয়ে ম'রে আছি কিন্তু তোর তো আর সে সব নাই, সপ্তাহে একটা দিনও কি তুই পারিস না আসতে?

আসব তো ভাবি কিন্তু পেরে উঠিনা।

নীলিমার কথায় লালিমা হেসে বল্ল: কেন? সংসার টংসার করছিস্ নাকি লুকিয়ে চুরিয়ে? তা তোদের বিশ্বাস নাই বাপু।

কেন বলো দেখি? বড় যারা তারা ছোটদের প্রায়ই শুনি ঐ কথা বলে, কিন্তু কিছু না জেনে শুনে এই যে তোমরা বল, এসব কি তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে?

দূর্ মুখপুড়ী ব'লে লালিমা নীলিমার গালদুটো টিপে দিয়ে বল্ল: চল্, আমার শাশুড়ীকে প্রণাম করবি আয়।

যাচ্ছি, ব'লে নীলিমা জিজ্ঞাসা করল: তোমার বাহনটা কোথায়? —হিতেন বাবু? তাঁকে দেখছি না যে!

আর কোথায় যাবে! দিন নাই রাত নাই এক আড্ডার জায়গা হ'য়েছে ঐ সামনের বাড়ীতে। এতো নিষেধ করি ও-বাড়ীতে আড্ডা দিতে, তা কে শোনে! মা'র নিষেধই শোনে না, তা আমি কোন্ ছার্।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করল: ও বাড়ী কাদের?

কাদের আবার! ওটা হতভাগার আখ্ড়া।

হতভাগার আখড়া, মানে ?

মানে, ওটা মেস বাড়ী।

নীলিমা বল্‌ল: মেস বাড়ী, তা' ওকথা বলছ কেন ?

ঝাঁঝাল সুরে লালিমা বল্‌ল: বলবো না! যতো জায়গার যতো হতভাগা এসে জুটেছে। যেমন হয়েছে ওর মালিকটী, তেমন তার সব সাঙ্গপাঙ্গ; সব সমান।

নীলিমা বল্‌ল: মেস যখন তখন তার আবার মালিক কি? মেসে সকলেরই সমান অধিকার। এই তো আমাদের আজকাল যেমন হ'য়েছে, এর আবার মালিক কি? তা হ'লে ওটা বোর্ডিঙ ?

লালিমা একথার উত্তর দিতে পারলনা। পাশের বাড়ীর বধু সে, কেমন ক'রেই বা দেবে। তবে তার স্বামীর মুখে সে যতটুকু শুনেছে তাই সে জানে তার বেশী সে কেমন ক'র জানবে? আর তার স্বামী—হিতেন, সে তো মেসের মালিক আশুবাবুরই বন্ধু।

আমরা যতদূর জানি আশুতোষ বাবু একজন মহাশয় লোক, ব্যাবসায়ী-বুদ্ধি তার মোটেই নাই, নইলে যে আসছে সে-ই কিছুকাল থেকে খেয়ে, একটী পয়সাও না দিয়ে এমনি ক'রে পালিয়ে যেতে পারে! দুর্মুখরা বলে; তাই যদি হবে, তবে তোমার কারবার চলে কি ক'রে, আর এ কারবার ক'রেছই বা কেন? আশুতোষবাবু বলেন যে তিনি লাভ করার উদ্দেশ্যে কারবার করেননি। ভাত বেচে ভাত কুড়তে যেন তাকে না হয় কোনও দিন। ও-কাজকে তিনি ঘৃণা করেন। তার এই কারবারের মূলে র'য়েছে বহু ভদ্র সন্তানের এক সঙ্গে মিলে মিশে বাস ক'রবার রমণীয় বাসনা এবং সুখ-সুবিধা। অসুবিধা ব'লে কেউ কোনও দিন এখানে একটা কথাও ব'লতে পারবেনা। আর অসুবিধা যদি কারো কিছু হয় তৎক্ষণাৎই তিনি তার প্রতিকার করবেন আর সেই জন্যই তো তিনি র'য়েছেন।

এমন সদাশয় আশু বাবু, তবুও লোকে তার বদনাম করে। এমনই সংসার! দুর্মুখরা তবুও বলে যে যখন পুলিশকে ফাঁকি দিতে তখন এটা মেস আর যখন মেম্বারদের গলায় ছুরি দিতে হয় তখন এটা বোর্ডিং।

আশুবাবু সদা সর্ব্বদাই মেম্বারদের জন্য ব্যস্ত তবুও তিনি তাদের মন পান না। অনেক দুঃখে বন্ধুকে তিনি বললেন: একেই বলে বরাত! 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।' যাদের সুখ সুবিধার জন্য কারবার ক'রলাম তারাই এখন······না এই-ই কলিকাল!

রমন বাবু ত' বুঝে উঠতে পারেনা যে তাদের ক্রটীটা কোথায়। তারা অনেক রাত ক'রে মেসে ফেরে? তাতে কার কি? তারা যদি রাত্রে না ই আসে তাতেই বা ব'লবার কার কি অধিকার আছে!

আশুবাবু ব'ললেন: তাতে নাকি তাদের সুনামের হানি হয়।

আচ্ছা, আমি দেখছি কে কতটা সাধু। তুই ভাবিস না আশু, আমি এর একটা ব্যাবস্থা করছি।

সদলে রমন বাবু বেরিয়ে গেলেন। ব'লে গেলেন যে তার আসতে রাত হবে, ভাতটা যেন তার ঘরেই ঢাকা দিয়ে রেখে যায়।

রমন বাবু বেরিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই প্রায় দশ-বারোটী মেম্বার এসে আশু বাবুর ঘরে ঢুকলো। আশুবাবু ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন: আসুন, আসুন, বসুন···

না আমরা ব'সতে আসিনি। আমাদের হিসাবগুলি একবার দেখে দিন তো চট্ ক'রে।

অপর একজন মেম্বার চাকরকে ডেকে একটা ঠেলা গাড়ী ডেকে আনতে বললেন। নইলে এতো সব বাক্স এবং বিছানা পত্র নিয়ে যাওয়া মুস্কিল হবে। সমস্ত শুনে এবং দেখে আশুবাবু যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন। আর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন: আমি যদি কোনরূপ অপরাধ ক'রে থাকি, তবে আপনারা

আমাকে যে শাস্তি দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু আমার এমন সর্ব্বনাশ করবেন না। আপনাদের আমি যেতে দেবনা, না, কিছুতেই না।

একটী মেম্বার বললেন: আমরা টাকা দেইনা পয়সা দেইনা, আমাদের রেখে তো আপনার লোকসান বই লাভ কিছু নাই তবে এমন ক'রছেন কেন? আর এটা যখন মেসই, তখন হাতে পায়ে ধ'রবার আপনারই-বা কি এমন দায়?

সেকথায় ভোলার মত আশুতোষ নন। ভদ্রলোকের দু'টী হাত ধ'রে কোনরূপে তিনি ব'ললেন: আমি যা ব'লেছি তার জন্য আপনাদের সকলের কাছেই আমি মার্জ্জনা চাচ্ছি। আর একটা মাস আপনারা আমাকে সময় দিয়ে দেখুন।

কয়েকজন মেম্বার বললেন: বেশ, আমরা পিনাকবাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে নেই।

বেশ, চলুন, তাঁর কাছেও আমি মার্জ্জনা চাইছি না হয়। ব'লে আশুবাবু সকলের আগে আগেই এগিয়ে চললেন।

আশ্চর্য্য! এমন বিনয়াবনত মহাদেবের মত আশুবাবু, তার বিরুদ্ধাচরণও মানুষ করে!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আশুবাবু যখন তার নিজের ঘরে ফিরে এলেন তখন রমনবাবু আবার যেন কেন ফিরে এসেছে। সমস্ত শুনে রমনবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক ক্রিয়া ক'রতে আরম্ভ করল। কিছু সময় চিন্তার পর তিনি রায় দিলেন যে, এ সমস্তই পিনাকের কারসাজি। নইলে এতোদিন তো এ-সব হাঙ্গামা হয়নি, আর ও-ব্যটা সপ্তাই এসেছে অমনি সব মেম্বারগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বোকারা এখন 'পিনাকদা' 'পিনাকদা' করছে, তারপর যখন একটী একটী ক'রে শ্রীঘরে পুরবে তখন দাদার আদরটা টের পাবে।

আশুবাবু বললেন : না হে, পিনাকবাবুর এতে কোন হাত নেই, আর তাঁর কথাতেই তো এরা সব ঠাণ্ডা হ'ল, নইলে তো সকলেই চ'লে যাচ্ছিল।

রমনবাবু মুখটাকে যথাসম্ভব বিকৃত ক'রে বল্‌ল :—যেমন তোমার বুদ্ধি। ত্রিশ টাকা ধার দিয়ে ও তোর মাথা কিনে রেখেছে নইলে ও-যে পুলিশের লোক তা' বোকাও বুঝতে পারে। আর এসব তো একটা চাল। হিতেন বল্‌ল : ওর চালচলন দেখে আমারও কিন্তু তাই মনে হয়।

নইলে, দেখনা, কখন কোথায় যায়, কখন আসে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। আমাদের সঙ্গে ভুলেও একটা কথা বলে কি? দিন রাত আছে বাইরে বাইরে। যদি কখনও মেসে ফিরল তাও সর্ব্বক্ষণের জন্য থাকবে ঘরের মধ্যে বন্দী। একেবারে যেন নবাবদের বোরখা-ঢাকা সুন্দরী বেগমটী। কেন-রে বাপু এতো কেন?

রমনের কথায় মনে হ'তেই আশুবাবু বললেন : ক'দিন ধরে দেখছি আবার কয়েকজন মেয়েছেলেও যাতায়াত ক'রতে সুরু ক'রেছে। বুঝলি রমন?

রমনবাবু তপ্ত খোলার উপর থেকে খইয়ের মত লাফিয়ে উঠল : এঁ্যা বলিস কি! তা হ'লে ও স্পাই না হ'য়ে যায় না আর! দাঁড়াও, ওকে আমি বিদায় করছি।

রমনের কথায় আশুতোষ বল্‌লেন : বিদায় ক'রতে পারো ভালই কিন্তু খুব সতর্ক হ'য়ে, অন্য কোন রকম অজুহাত দেখিয়ে।

রমন বাবু উত্তর করলেন : সে ঠিক হবে, তোকে আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না!

আশুবাবু যখন পিনাকের বিরুদ্ধে এমনি সব আলোচনা ও পরামর্শ করছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও মনে করতে পারেনি যে সেই রাত্রেই আবার তাকে পিনাকের শরণ নিতে হবে।

মেসে ফিরতে বরাবরই পিনাকের রাত হয়। সে দিন, রাত তখন প্রায় বারোটা, পিনাক সরু রাস্তাটায় ঢুকবে এমনি সময় কে যেন তার নাম ধ'রে ডাকল; পিনাক থমকে দাঁড়াল। আবার সেই স্বর; 'পিনাকবাবু!'

পেছন ফিরে দাঁড়াতেই পিনাক দেখল একটা ট্যাক্সি হ'তে নামলেন আশুবাবু, সঙ্গে একটা বৃদ্ধ বোধ হয় কারো দরোয়ান। আশুবাবু এসেই পিনাকের দুটী হাত জড়িয়ে ধরল: পিনাকবাবু! আমায় বাঁচান। আমার মান, সম্মান সব গেল। পিনাক অবাক অপ্রস্তুত, বলল: এ সব কি!

আশুবাবুর সঙ্গী বৃদ্ধ বলে উঠলো: তোমার কি সম্মান জ্ঞান আছে বাবু! ট্যাকে যদি টাকাই না ছিল তবে খুঁজে খুঁজে ডালিমবিবির দরজায় গিয়েছিলে কেন?

ব্যাপারটা এবার পিনাক আংশিক ভাবে বুঝতে পারল। বলল: টাকা পাবে, তার উপর কোনও কথাই নাই, কিন্তু ভদ্র লোকের সম্মান রেখে কথা বলতে জানোনা?

পিনাক হয়তো আরও কিছু ব'লত কিন্তু আশুবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন: চুপ করুন পিনাকবাবু নইলে লোক জানাজানি হ'য়ে যাবে। বিশেষ গাড়ীতে ডালিম রয়েছে।

আশুবাবুর সতর্কতা দেখে পিনাক হাসল মাত্র। জিজ্ঞাসা করল: আপনার কাছে কত টাকা পাবে?

আশুবাবু নীরব, উত্তর দিল সেই বৃদ্ধ : টাকা তো অনেক বাবু কিন্তু দেবে কে? অপনি দেবেন কি?

ব'লে সে পিনাকের পানে তাকাল। পিনাক বল্‌ল : কতো টাকা না শুনে কি ক'রে বলি।

ব'লতে গেলে অনেক কিছুই যে ব'লতে হয় বাবু। ব'লে বৃদ্ধ আবার বলতে সুরু করল : এই ধরুণ, ত্রিস দিনের মদের দাম বাকী, তবল্‌চী বাকী ; ফুলউলীর বাকী, পানওলার পান চুরট, চায়ের দোকানের চপ কাট্‌লেটের দাম বাকী, তার উপর রয়েছে বিবির পাওনা। ক্ষণকাল নীরব থাকবার পরও পিনাক যখন আর কোন কথা বল্‌লনা, তখন বৃদ্ধ আবার বল্‌ল : কি বলব বাবু, এ বাবু একরকম বাকীরই বাবু।

তাই যদি জানো, তবে বাকী দিয়েছিলেই বা কোন্ বুদ্ধিতে আর এখন ভদ্রলোকের পাড়ায় এতো রাত্রে এই সব কেলেঙ্কারী ক'রতে এসেছই বা কোন্ আক্কেলে? এতো টাকা আমি দিতে পারব না।

পিনাকের কথা শেষ না হ'তেই আশুবাবু তার দু'হাত জড়িয়ে ধ'রে ব'লতে লাগল : দোহাই আপনার পিনাকবাবু, আমায় পুলিশে দেবেন না। আমি জানি আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে বাঁচাতে পারেন।

পিনাক বল্‌ল : কি ক'রে পারি বলুন? আমার কাছে টাকা নাই।

কিন্তু আপনার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আপনি ইচ্ছা ক'রলে আমাকে বাঁচাতে পারেন।

পিনাক উত্তর কর্‌ল : বন্ধু-বান্ধব তো আপনারও কম নাই আশুবাবু। ঘরে যে আপনার সন্ধ্যাবেলায় লোক ধরে না! আর, এতো রাত্রে কা'র দোরে গিয়ে আপনার এই গুণ কীর্ত্তন ক'রে টাকা চাই?

তা' হ'লে! নিদেন,..... যা হ'ক কিছু টাকা পেলেও হ'ত!

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে পিনাক বল্‌ল : কিছু টাকা কোন রকমে দিতে

পারি কিন্তু যেতে হবে একটু দূরে। বৃদ্ধ বল্‌ল: গাড়ী তো রয়েছেই বাবু, আসুন না।

সকলে গাড়ীর কাছে এগিয়ে আসতেই ডালিম সন্ত্রস্থ হ'য়ে একপাশে স'রে বসল জড়সড় হ'য়ে। আশুবাবুকে মাঝে রেখে পিনাক উঠে গাড়ীতে বসল।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল: কাঁহা যায়েগা বাবু?

পিনাক বল্‌ল: ভবানীপুর।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: ভবানীপুরে······কোথায় যাবেন?

হেসে পিনাক বল্‌ল: ভবানীপুর আফ্‌গান ব্যাঙ্কে যাব।—চেনেন নাকি?

আশুবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন: এতো রাত্রে ব্যাঙ্ক কি খোলা থাকে? আর ভবানীপুরে ব্যাঙ্ক আছে নাকি?

ডালিম সহসা বলে ব'সল: কাবুলীর কাছে বুঝি?

আশুবাবু যেন ভূত দেখলেন এমনি ভাবেই আঁৎকে উঠে বললেন: না না মশাই, ওরা সব ছোটলোক—ওদের কাছে গিয়ে দরকার নাই।

পিনাক তার অবস্থা দেখে হেসে বল্‌ল: ছোট কোথায়? তারা যে এক একটা আমার আপনার ছু'জনার মত হবে!

আশুবাবু বল্‌লেন: এক একটা মশাই জানোয়ার! ঐ কি মানুষের আকৃতি!

তা বটে!—কিন্তু আশুবাবু! মানুষের আকৃতির সঙ্গে আপনার আকৃতির তো কোন পার্থক্য নাই!

আশুবাবু পিনাকের এ কথার গুরুত্ব কতটা বুঝলেন কে জানে কিন্তু চুপ করেই রইলেন।

পিনাক বল্‌ল: কাবুলীর একটা রূপই দেখেছেন আশুবাবু,—লাটি হাতে বাড়ীর দরজায় এসে ব'সে থাকে যমদূতের মত, না?—কিন্তু তাদের আর কোনও রূপ আপনার চোখে পড়েনি। কোন আত্মীয় বান্ধব যখন টাকা দেয়নি তখন ঐ জানোয়ারই আপনাকে না জেনে শুনেও টাকা দিয়েছিল।

সহসা ডালিম বল্‌ল : দেখুন পিনাকবাবু, আপনি হয়তো আমায় বেহায়া মনে করতে পারেন, তা' করুন। যে পরিচয় নিয়ে এতো রাত্রে মানুষ তাড়া ক'রে আমি ভদ্রপল্লীর মধ্যে এসে ঢুকেছি তাতে আপনি আমাকে নূতন ক'রে যা ভাববেন তাতে আমার সম্মানহানি হবে না।

পিনাক ডালিমের এই অতর্কিত কথায় বিস্ময় বোধ করল। তবুও বল্‌ল : বেশ তো বলুন না কি ব'লবেন ?

ডালিম ব'লতে লাগ্‌ল : সমাজ বা জগতের সঙ্গে আমাদের যে কি সম্বন্ধ তা আপনি জানেন। মনুষ্যত্ব আমাদের নাই, থাকতে পারেও না, তবুও যখন আমরা সে কথা চিন্তা করি তখন আমরাও আঁৎকে উঠি। সংসারে ঢুকে, সেখানে গিয়ে আমরা প্রতারণা করিনা, নরকে বসেও আমাদের প্রতারণা করবার প্রবৃত্তি হয়না, প্রয়োজনও হয় না।

আমরা পতিতা, অন্তর আমাদের নাই—এই-ই বিশ্ব-বিদিত কথা। সমাজের দরজা যেদিন এই সব অভাগিনীদের চোখের সামনে বন্ধ হ'য়ে যায় সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই ছিন্ন হ'য়ে যায়—সমাজের সঙ্গে এদের অন্তরের যোগাযোগ। যে পাপ একবার, একটী মুহূর্ত্তের জন্য ক'রে হ'ল তাদের পতন ; সমাজ সেই পাপ চিরজন্মের পাথেয় ক'রে তাদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে সমাজের দরজা বন্ধ ক'রে দেন।

সমাজকে রক্ষা ক'রতে সমাজের বিধানদাতাদের রক্ষা ক'রতে তারা রইল দূরে ····শুধু তাদের দেহ নিয়ে। তাই, আমাদের সংসারে মন বা অন্তর নাই, তার উচ্চ কোন প্রবৃত্তি বা তার পরিচয়ের আড়ম্বরও নাই, এ সত্যি কথা।

পিনাক নীরবেই ডালিমের কথা শুনতে লাগল।

ডালিম বলতে লাগল : সমুখের দরজা বেশ ক'রে এঁটে দিয়ে পেছন দরজা দিয়ে যখন এই সব সমাজের দেবতারা আমাদের ঘরে আসেন পায়ের ধুলো দিতে তখন ভেবে দেখুন, আমরা কি ভাবে পারি তাঁদের অভ্যর্থনা করতে!

এই দুই পক্ষের মধ্যে অন্তরের কথা কি উঠতে পারে কোনও দিন?—অর্থদান ক'রে তাঁরা তাদের পাপ ক্ষালন ক'রে যান আর আমরা তাই কুড়িয়ে আমাদের নরক সাজাই। নইলে, যতোই যে পতিত হ'কনা, সকলেই এরা বাংলার মাটিতে জন্মেছে। স্বামী, পুত্র পরিজনের সংসার ছেড়ে নরকে বসে নারীত্বের বিনিময়ে যাদের এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়···ভাবতে পারেন কি একবার তাদের অবস্থাটা? কিন্তু তাদেরও যারা দাগা দেয়, নীচতায় তাদেরও যারা হার মানায় তাদের আপনি কি বলবেন?

কিছু সময় নীরব থেকে আবার ডালিম ব'লে উঠল: আপনি তো একজন সমাজের নেতা?

পিনাক আপত্তির স্বরে বলল: কে বললে? আমি সমাজের কেউ নয়, আমার সমাজ নাই।

ডালিম বলল: তবুও আপনি সবল পুরুষ।

কী এক অশুভক্ষণেই যে শুভ দৃষ্টি হ'য়েছিল জানি না কিন্তু তারপর আর কখনও স্বামী এ চোখের দিকে তাকাননি, সেই একবার ভিন্ন আমিও কখনও আর তাঁকে দেখিনি। সেই থেকে দীর্ঘ সাতটী বৎসর আমি পিত্রালয়ে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছি। চিঠির পর চিঠি লিখেও স্বামীর নিকট হ'তে কোনও উত্তর পাইনি। এই দীর্ঘ বৎসর ধ'রে আমি সেই শুভ-দৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে ভবিষ্যতের বুকে অসংখ্য কল্পনার দাগ কেটেছি শুধু। লোকের মুখেই শুনলাম আমার স্বামী অসচ্চরিত্র, মাতাল। সমাজ শাস্ত্র বলল; সেই স্বামীরই ধ্যান ক'রে জীবন অতিবাহিত ক'রতে।

শুকনো কলমে শুকনো পাতার উপরেই শুধু ও-কথা সুন্দর দেখায় কিন্তু রক্ত মাংসের বুকে ঐ বিধান এক ফোঁটা শান্তি দিতে পারে কি?—আপনিই বলুন?

তাই একমাত্র বন্ধন বুড়ো বাপও যেদিন দেহত্যাগ করলেন সে দিন ঐ বুড়ো চাকরকে নিয়েই ভেসে প'ড়লাম। কারণ, আপনাদের সমাজ এই অভিবাবকহীনাকে যে কীরূপ আদর যত্ন ক'রত, কি শাস্তিতেই তাকে রাখত, তা তো আমার জানতে বাকী নাই! এতে তবু নিজের মনে একটা সান্ত্বনা আছে। অন্ততঃ নিজে আমি মনে মনে জানি, লোকে যাই বলুক না কেন, আমি জোর গলায় বলতে পারি আমি অসতী নই।

পিনাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল ডালিমের মুখের পানে। তার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভঙ্গীর যে অর্থ সেও যেন ডালিমের কথায় সত্যতা প্রমাণ করে। অথচ এই আশুবাবু; হাতে হাতে যার ·····।

পিনাক ভাবতে থাকে। হঠাৎ এক সময় সে ব'লে উঠল: আপনার দিক থেকে আপনি যা ব'ললেন হয়তো তা সত্যিই। আমি কেন, হয়তো কেউ এর প্রতিবাদ ক'রতে পারবেনা। তবে আমার বিশ্বাস যৌবন যা অকাতরে ব্যয় ক'রে, দু'হাতে ছড়িয়ে, হেলায় ফেলায় নষ্ট ক'রে আনন্দ পায়, বার্দ্ধক্য দীননেত্রে তার পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চোখের জল ফেলে।—পাপ ক'রলে অনুতাপ এক দিন আসবেই আর এই অনুতাপ যাকে সত্যিই কোন দিন স্পর্শ করেনা পাপ তার জীবনের কোথায়ো ছাপ ফেলতে পারেনি বলেই মনে ক'রব। কিন্তু শেষ না দেখে, জীবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে সে বিচার তো ব'লতে পারেনা।

ডালিম বলল: সে কথা আমি স্বীকার করি। আর একটা কথা, যেটা শুধু আপনাকেই ব'লতে পারি। আজ সমাজেও যে ঐ বেশ্যাবৃত্তির স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, অন্তরে অন্তরে প্রতি বন্ধুতে বন্ধুতে, ভাইয়ে ভাইয়ে এমন কি পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতেও তুচ্ছ ঐ ব্যবসাদারী দেনা আর পাওনার হিসাব নিকাশ। —তা'র ক'রছেন কি আপনারা? সকলেই আজ শুধু চায়। এই 'চাওয়া' পূরণ ক'রতে না পারলেই কলহ, অসন্তোষ

এমন সময় ড্রাইভারের কথায় সকলের চমক ভাঙল।

রঘুদা! আর একটা ট্যাকসি ডাকো।

ব'লে ডালিম পিনাকের পানে তাকিয়ে বলল: আজ রাত্রের কথা আপনি ভুলে যান, ভাল, মনে রাখেন, সুখের কিন্তু আপনাকে যে মনের কথাগুলি শোনাতে পারলাম এতেই আমি তৃপ্ত।

ডালিমের এ-কথায় পিনাক বলল: আপনার কথা সব আমার কাছে হেঁয়ালীর মত লাগছে। এক একবার মনে হচ্ছে যেন আমি আপনার পরিচয় ধ'রতে পারছি, কিন্তু·········

অতি পরিচিতের মত স্বরে বাধা দিয়ে ডালিম বলে উঠল: না না, এখন না। যদি বুঝেই থাকেন, ভালো, দয়া ক'রে এঁকে তবে একবার পাঠিয়ে দেবেন। ব'লে সে ইঙ্গিতে আশুবাবুকে দেখিয়ে দিল।

রঘু বলল; ট্যাক্সি এসেছে দিদিমনি।

ট্যাক্সিতে উঠে ডালিম নমস্কার ক'রে বলল: আপনাকেই অনর্থকষ্ট কষ্ট দিলাম কিন্তু আমার কষ্টটা সাথক। অবশিষ্ট কথা শোনা গেলনা হাওয়ায় ভেসে গেল।

পিনাকের মাথার ভিতর গোল পাকাচ্ছে তখন রাশি রাশি চিন্তার সূত্র।

## ইঙ্গিৎ

সবে মাত্র সরু গলিটায় কাঁচা রোদের ছায়া এসে প্রবেশ ক'রছে এমনি সময় মেস্‌বাড়ীর সদরে সহসা একটা গণ্ডগোল আরম্ভ হ'ল। যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে বাইরে এল।

লালিমা স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে নীলিমার সঙ্গে কথা বলছিল এমনি সময় লালিমার শাশুড়ি এসে ব'ললেন: দেখো তো বৌমা, রাস্তায় হিতুর গলা শুনছি যেন!

লালিমা স্টোভে 'পাম্প্' ক'রতে ক'রতে ব'লল: ও তো রোজই শোনেন, দেখবার আর কি আছে ওতে!

তর্ক না ক'রে দেখ না!

শাশুড়ির কথায় অগত্যা লালিমা এসে জানলায় দাঁড়ল, সঙ্গে সঙ্গে নীলিমাও এসে দাঁড়াল তার পাশে। মেসবাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হিতেন তখন চিৎকার ক'রে ব'লছে: যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে, আর না, এবার সব তলপি তলপা নিয়ে স'রে পড়ুন। ভদ্রলোক জেনে পাড়ার মধ্যে এমনি বাড়ীর সামনে এই সব বাডোয়ারী মেস ক'রতে দিয়েছিলাম, তার শাস্তি যথেষ্ট হ'য়েছে।

আশুবাবু ও রমণবাবু ছুটে বেরিয়ে এলেন, অন্যান্য মেম্বারও এলেন দু'চারজন।

রমনবাবু প্রশ্ন ক'রলেন: চিৎকার ক'রছেন কেন হিতেন বাবু? কি হ'য়েছে?

যথেষ্ট হ'য়েছে মশাই, আর না, এবার ভালয় ভালয় স'রে পড়ুন সব।

নীলিমা লালিমার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রল: কি হ'য়েছে?

লালিমা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর ক'রল: কি জানি ছাই আবার আমার কোন্ মাথা মুণ্ডু হ'ল!

আশুবাবু ব'ললেন: কি হ'য়েছে হিতেন বাবু, আমায় বুঝিয়ে দিন দেখি?

হিতেনের কিন্তু বোঝাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তবে তার এই অমানুষিক চিৎকার এবং বহুবিধ সাধুবাক্যের মধ্য থেকে যে তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল তার মূলে মেসস্থ কোনও এক মেম্বারের বিরুদ্ধে র'য়েছে হিতেনেরই বাড়ীর কোন এক মহিলার সম্ভ্রম হানির ঘৃণ্য অভিযোগ। কাল তার বাড়ীতে কে একজন তার আত্মীয়া এসেছেন আর সেই হ'তে আরম্ভ হয়েছে নাকি এই উৎপাৎ!

সমস্ত শুনে রমন বাবুর দগ্ধ-কাষ্টনিভ সুগোল দেহখানি লজ্জা এবং ঘৃণায় পীতবর্ণ ধারণ ক'রল। কম্পিত কণ্ঠে কোনরূপে তিনি ব'লতে পারলেন: ছিঃ। এমনি জঘন্য অন্তর নিয়ে যারা ভদ্র সমাজে বাস করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ।

আশুবাবু ব'ললেন: এতদিন ধ'রে আমরা র'য়েছি হিতেনবাবু, কিন্তু কোন দিন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখেছেন কি?

আশুবাবুর কথায় কে যেন ব'লল; এ তা' হ'লে মশাই কোন নূতন মেম্বারের কীর্ত্তি।

আশুবাবু ব'ললেন: বেশ তো, আপনি আমাদের একবার দেখিয়ে দিন, পরে আমরাই এর ব্যবস্থা করছি।

একটী মেম্বার জিজ্ঞাসা ক'রলেন: আপনি তাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো মশাই?

হিতেন উষ্ণ হয়েই ব'লল: আমি কি তাকে অত দূর থেকে ভাল ক'রে দেখতে পেয়েছি।

তবে যে দেখেছে, তাকেই নিয়ে আসুন মশাই। পরের মুখে ঝাল খেয়ে এতোগুলি ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ছুটে এসেছেন কোন্ বুদ্ধিতে?

অপর একজন ছাত্রবাবু ব'ললেন : আপনার সেই মহিলাটীকেই তবে ডেকে আনুননা।

হিতেন ব'লল : আমি ঘর দেখিয়ে দিতে পারি। ঐ যে উপরের ঐ ঘর, আমার ঘরের সামনেই যে—ব'লে আঙ্গুল দিয়ে সে সে-ঘর দেখিয়ে দিল সে ঘরে থাকে…… পিনাক।

বেশ, বেশ, তাতেই হবে, আসুন দেখি দেখিয়ে দেবেন, ব'লে আশুবাবু ও রমন হিতেনকে একরূপ টেনে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রলেন।

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে নীলিমা ও লালিমা পরস্পর মুখ চাওয়া চাউয়ি ক'রল। লালিমা ব'লল : কিছু বুঝতে পারছিনা তো !

নীলিমা ব'লল : হিতেনদার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি ?

বাইরে থেকে ধাক্কা দিতেই দেখা গেল চারধারে রাশিকৃত খোলা বইয়ের মাঝখানে বসে আছে পিনাক,—যেন মৃন্মূর্ত্তি। একটা কাঁচের গ্লাস, অর্দ্ধেকটা তার ভাঙা,—সেটা হ'য়েছে তার 'য়্যাস-ট্রে', তারই পাশে একটা খোলা সিগারের বাক্স, তার পাশেই কতগুলি অর্দ্ধ-দগ্ধ সিগার। দূরে স্টোভে জল গরম হচ্ছে, তার পাশে কয়েকটা ফাটা ভাঙা চায়ের কাপ, চায়ের কৌটা চিনির কৌটা ছড়িয়ে রয়েছে।

খোলা জানালা দেখিয়ে দিয়ে হিতেন ব'লল :—ঐ দেখুন জানালা খোলা কি না ?

তাদের সাড়া পেতেই পিনাক চোখ মেলে তাকাল। জিজ্ঞাসা ক'রল : কি চাই আপনাদের ?

আশুবাবু ব'ললেন : ইনি হিতেনবাবু, আমাদের সামনের বাড়ীতেই থাকেন। ইনি এসেছেন…

নমস্কার ক'রে পিনাক উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল : কি জন্য এসেছেন ?

আশুবাবু ও রমনবাবু পরস্পরের পানে তাকালেন। হিতেনের পানে চেয়ে পিনাক আবার ব'লল : কি জন্য এসেছেন বলুন ? সত্যিই যদি কোন প্রয়োজনীয় কথা থাকে, ভিতরে এসে বসুন, আর তা' না হ'লে—আমার বিশেষ কাজ রয়েছে······

আশুবাবু ব'ললেন : ওর একটা অভিযোগ আছে।

অভিযোগ ! হেসে পিনাক ব'লল : তা' আমাকেই কি আপনি বিচারক ঠাউরে নিয়েছেন আশুবাবু ?

না, অভিযোগটা হ'চ্ছে,······ব'লে কিছু সময় নীরব থেকে আশুবাবু হিতেনের পানে চেয়ে ব'ললেন : বলুন না মশাই।

বিরক্ত হ'য়ে পিনাক ব'লল : আমি আপনাদের আগেই বলেছি রসিকতা ক'রবার আমার সময় নাই।

আশুবাবু ব'ললেন : আপনি নাকি সব সময়ই ঐ জানালাটা খুলে রাখেন ;

এই অভিযোগ ? পিনাক বিস্মিত হ'ল। ব'লল : হ্যাঁ, রাখি।—আপত্তি আছে নাকি আপনাদের তাতে ?

এবার হিতেন ব'লে উঠল : হ্যাঁ, আছে।

কারণ ?

কারণ, এঘর থেকে আমার ঐ ঘরের সমস্তই দেখা যায়।

অন্ধ যখন নই, দেখা যখন যায়ই,···তখন না দেখে কি ক'রব বলুন ?

পরক্ষণেই পিনাক আবার ব'লল : তবে যদি বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে দেখাতে আপনার আপত্তি থাকে তবে সেটিকে লুকিয়েই রাখবেন, আর না হয় জানালায় একটা পর্দা দেবেন।—কারণ আমার জানালা দিয়ে আমি তাকাবই। আর, তাতেই যদি আপনার আপত্তি থাকে—বাড়ীওলাকে গিয়ে বলুন জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে। সে না দেয়, মিউনিসিপ্যাল আফিসে

রিপোর্ট করুন, সব গণ্ডগোল মিটে যাবে।—আমার আপনার বিবাদ ক'রবার প্রয়োজন হবেনা।

রমনবাবু আর একটু জোর দিয়ে দিলেন। তিনি ব'ললেন: সকলে বলাবলি করছিল রাস্তায়,—এই নীচেই শুনলাম; আপনি নাকি ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে কিসব ইঙ্গিৎ করেন।

পিনাক উত্তর ক'রল: হ্যাঁ করি বৈ কি!

আশুবাবু পিনাকের উত্তর শুনে বিস্মিত হ'ল। হিতেন ব'লে উঠল: শুনলেন তো মশাই, নিজের মুখেই স্বীকার ক'রছে।

পিনাক ব'লল: হ্যাঁ করছিই তো! কেন, তিনি কি অস্বীকার ক'রছেন নাকি? ব'লে পিনাক মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

সে হাসি হিতেনের অসহ্য বোধ হ'ল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে ব'লে উঠল: আপনাকে আমি দেখে নেব মশাই। আপনারা সব সাক্ষী রইলেন। কোর্টে—যদি··· ··

পিনাকের উচ্চ হাসিতে হঠাৎ সে থেমে যেতে বাধ্য হ'ল।

পিনাক ব'লতে লাগল: দাদাদের আমার কী বুদ্ধি। কাল রাতের ঘোর আজ দিনের আলোতেও দেখছি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বেশ! ঢাক ঢোল পিটিয়ে সহরশুদ্ধ সকলকে সাক্ষী মেনে নিয়ে কোর্টেই যান—আমি সব স্বীকার ক'রব সেখানে।—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও ব'লবেন না, তা' হ'লে আমিও ভদ্রতার সীমা পেরোতে বাধ্য হব।

আশুবাবু পিনাকের নিকটে এগিয়ে এসে চুপি চুপি কি ব'লতেই পিনাক হেসে উঠে ব'লল: বাঃ! আপনাদের বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারা যায় না। তা' এ ব্যবসা আবার আরম্ভ ক'রলেন কবে থেকে?

আশুবাবু ব'ললেন: বু'ঝতে পারছেন তো,···এ নিয়ে একটা ঘাটাঘাটি করা······

পিনাক ব'লল : ওঃ! আপনারা সেটা বোঝেন দেখছি! কিন্তু টাকা দিতে হয় তো কোটেই দেব। আপনারা যান, আর বিরক্ত ক'রবেন না। সতীত্বই বলুন আর সুনাম সম্মানই বলুন এটা যে মেয়েদেরই একচেটে নয়, আপনাদের মত পুরুষ তা' কল্পনাও ক'রতে পারে না। কিন্তু ঘর বেঁধে রেখে বাইরের বাঁধন কেটে বেড়ানোই যাদের স্বভাব তাদের ঘরের বাঁধনও থাকে না কোন দিন, জানবেন।

আশুবাবু আবার পিনাককে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপে চুপে কি যেন ব'ললেন, শুনে পিনাক হাসতে লাগল।

আশুবাবু ব'ললেন : বুঝছেন তো সব?

হু, বলে পিনাক খুঁজে খুঁজে একটা বই হাতে নিয়ে আবার প্রশ্ন ক'রল : আচ্ছা আশুবাবু! আমার আগে এ-ঘরে যে ভদ্রলোকটী ছিলেন, তিনি কি ক'রতেন? বেশ পয়সাওয়ালা ছিলেন নিশ্চয়ই?

আশুবাবু নীরব।

বইটা খুলে তার ভিতর থেকে পিনাক বের ক'রল কয়েকখানা দশটাকার নোট। পরে নোটগুলি হাতে নিয়ে ব'লল : ব্যবসাটা মন্দ না। আপনার কতো 'পার্সেণ্ট' আশুবাবু?

আপনাদের খেয়েই তো আছি, বিশেষ আপনার ঋণ। ব'লে আশুবাবু এক অদ্ভুৎ ভাবে হাসতে লাগলেন হেঁ হেঁ ক'রে। বেশ বোঝা গেল হাসতে যেন কোথায় তার ব্যথা লাগছে কিন্তু কোথায় তা কে জানে!

পিনাকের ঘরে যখন এই অভিনয় চলছিল তখন সকল অশান্তির মূলস্থান হিতেনের ঘরের সেই জানলায় দাঁড়িয়ে লালিমা ও নীলিমা উৎকর্ণ হ'য়ে এদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করছিল।

পিনাকের কণ্ঠস্বর শুনে নীলিমার সন্দেহ হ'য়েছিল কিন্তু সে কিছুতেই স্মরণ ক'রতে পারছিল না যে এ কে! শুধু মনে হচ্ছিল এ স্বর তার পরিচিত, অত্যন্ত পরিচিত। তারপর পিনাক যখন নোটগুলি হাতে ক'রে জানালার কাছে এগিয়ে এসে ব'লল: টাকাই যখন দিচ্ছি, তখন ঐ জানলার দিকে আমি তাকাতে পারব, কি বলেন ?—নীলিমা তখন চমকে উঠল।

পিনাক হয়তো আরও অনেক কিছু ব'লত কিন্তু হিতেনের জানলার পানে তাকিয়ে আর বলা হ'ল না। নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই নীলিমা হাত তুলে তাকে নমস্কার ক'রল। আশুবাবু রমনবাবু, মেসের অন্যান্য মেম্বার, সবাই বিস্মিত। এমন কি হিতেনও বুঝতে পারলনা ব্যাপারটা কি হল।

লালিমা জিজ্ঞাসা ক'রল: কে রে ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নীলিমা ব'লল: হিতেনদার আহাম্মকির ফল আমাকেই ভুগতে হ'ল শেষটায়! এখানে এসে দাড়ানোই হ'য়েছে আমার অন্যায়। ছি ছিঃ!

সে তো নিজের কানেই হিতেনকে ব'লতে শুনেছে যে, কাল আমার এক আত্মীয়া এসেছে, আর সেই থেকেই আরম্ভ হয়েছে এই উৎপাৎ! এখন যদি সে সুধাবাবুর সঙ্গে কথা না বলে তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝবেন, আর যদি সে দেখা করে তাতেও এই কেলেঙ্কারী বাড়বে বই কমবে না।

নীলিমা যে কি ক'রবে বুঝতে পারছিল না কিছু। লালিমা জিজ্ঞাসা ক'রল: ও কে রে নীলি ?

ও আমাদের সুধা দা। আর একদিন ব'লব ওঁর কথা।

ব'লেই সে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল, আর লালিমা সমস্ত ঘটনাটা চিন্তা ক'রে লজ্জায় ও দুঃখে মরমে মরে গেল। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে পাথরের মত।

একতাড়া নোট হাতে পিনাককে নীচে নামতে দেখে মেসের সমস্ত মেম্বাররা তাকে ঘিরে ধ'রল : আজ আপনি নূতন একটা কিছু পেয়ে গিয়েছেন, আমাদের কিন্তু খাওয়াতে হবে পিনাকদা।

পিনাক হেসে ব'লল : নিশ্চয়ই খাওয়াব, কিন্তু তার আগে পাওনার মূল্যটা দিয়ে নিতে দাও। তোমরা সকলে সাক্ষী রইলে···আমি কোন এক মহিলার সম্ভ্রমহানির মূল্য স্বরূপ এঁদের পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে রাখছি।

আশুবাবু চুপি চুপি ব'ললেন : আর পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন কেন ?

পিনাক কিন্তু উচ্চকণ্ঠেই বলল : Advance, Advance ! যাকে বলে আগাম দাদন। ব'লে সে আশুবাবুর দিকে নোটগুলি এগিয়ে দিল।

আশুবাবু ব'ললেন : আমাকে কেন ? হিতেন বাবুকে দিন।

হিতেন তখন কোন কথা না ব'লে সদরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কয়েকজন মেম্বার চিৎকার ক'রে উঠল : টাকাটা নিয়েই যান হিতেন বাবু। আর লজ্জা ক'রে লোকসান ক'রছেন কেন ?

হিতেন কোন কথার জবাব দিল না, এমন কি পেছনে একবার ফিরেও তাকাল না।

আশুবাবুর পানে তাকিয়ে পিনাক ব'লল : আমার কোন দোষ রইলনা কিন্তু। বন্ধুকে আপনার এখনও ফেরান আশুবাবু।

আশুবাবুও এবার নীরব। বন্ধুকে ফেরান দূরে থাক্ তিনিও গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। কয়েকটী মেম্বার নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। একটা কথা শোনা গেল শুধু, একেই বলে, 'যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর'।—এদের শিক্ষা দিতে এই-ই দরকার।

এমনি সময় সদর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা ক'রলেন: ওহে! এখানে সুধাবাবু কে আছেন জানো? একটী মহিলা তাঁকে খুঁজছেন।

আবার মহিলা!

সকলে বিস্মিত হ'য়ে দেখল মেয়েটী সুধারায়কে খুঁজতে এসে পিনাককে দেখে ব'লল: এই যে! আপনাকেই আমার দরকার।

পিনাক ব'লল: উপরে আসবেন কি?

নীলিমা উত্তর ক'রল: না। আপনার যদি তাড়া না থাকে তবে দয়া ক'রে আমায় খানিকটা এগিয়ে দিন না।

পিনাক জিজ্ঞাসা ক'রল: কোথায় এসেছিলেন এখানে?

সে কথা আর ব'লবেননা!

নীলিমার কথা শেষ না হ'তেই পিনাক ব'লল: হিতেনবাবুর জানালায় আপনাকে দেখলাম ব'লে মনে হ'ল।

পিনাকের কথায় নীলিমার মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল।

হ্যাঁ, ওঁদের বাড়ীতেই এসেছিলাম।

আচ্ছা চলুন···চ'লতে চ'লতেই কথা হবে। পিনাক নীলিমার সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়ল।

জানলায় দাঁড়িয়ে লালিমা সমস্তই দেখল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলনা।

যখন তারা দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেল তখন রমনবাবু আশুবাবুকে ব'ললেন: ওহে! দেখলে তো। সত্যের কল বাতাসে নড়ে। এবার তো যাদু হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেলেন!

মেয়েরা তখন কেউ ক্লাসে কেউ বা এ ঘরে ওঘরে জটলা ক'রছে···
নীলিমা এসে মেসে প্রবেশ ক'রল।

নির্জ্জনতার জন্য তখন সে হাঁপিয়ে উঠেছিল তাই লীলাকে ঘরে দেখে সে আর সে-ঘরে প্রবেশ ক'রলনা; পাশের ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়ল ঘুমোবার উদ্দেশ্যে। ঘুম কিন্তু এলোনা, ঘুরে ফিরে রায়ের কথাগুলিই এসে মনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে তার তন্দ্রা ভাঙাতে লাগল।

নীলিমা দেখে বিস্মিত হ'ল যে হিতেনের এই অভদ্র আচরণ তাকে একটুও রাগাতে পারেনি। নীলিমার সঙ্গে সেই-কথা প্রসঙ্গে রায় ব'লল: আপনি জানেননা তাই ও-কথা ব'লছেন। আমাদের দৈন্যের শেষ নাই। আর এ দৈন্য শুধু একরকমেরই নয়; দৈন্য আমাদের অন্ন-বস্ত্রের, দৈন্য আমাদের অর্থের কিন্তু সব চেয়ে বড় দৈন্য আজ আমাদের বিচার শক্তির। আর এই দৈন্যই অন্য সমস্ত অভাবকে বড় ক'রে বাড়িয়ে তুলেছে।

'ইনসলভেন্সী' নিয়ে বাজারের দেনা এড়ানো যায় কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মানুষ পারেনা তার নিত্যকার পেটের এবং অন্তরের চাহিদাকে চোখ রাঙিয়ে দাবিয়ে রাখতে।

ঠিক তেমনই বড় বড় অনেক কাজই আমরা ক'রে থাকি। দেশের জন্য এক কথায় পারি আমরা হাজার হাজার টাকা দান ক'রতে কিন্তু বাড়ীর দরজায় যখন এক মুঠো চালের ভিখারী আসে তখন আমাদের চক্ষু স্থির হয়। স্বরাজ বা সাম্রাজ্য নিয়ে আমরা এতোই ব্যস্ত যে ঘর বা বাড়ীর কথা ভুলেই গিয়েছি। সাম্রাজ্যের ভাগ বাটোয়ারা, স্বরাজী দলের ভেদ-বিদ্বেষ, এ সবের মীমাংসা আমরা এক কথায় সেরে দিতে পারি; কিন্তু ঘরে যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের পরমায়ু নিঃশেষে নিংড়ে নিচ্ছে তাকে বন্ধ

ক'রবার কৌশল আমরা যেমন জানিওনা তেমনি তার পানে দৃষ্টিও দেইনা,— একা হিতেনবাবুর দোষ কি ক'রে বলি ?

নীলিমা ব'লল : আপনি যখন তা' বুঝতে পারছেন তখন তার প্রতিকার করেন না কেন ?

এ কথায় রায় একটু হেসেছিল মাত্র।

হিতেনদার এই ইতরামির কি বিচার ক'রলেন আপনি ?

এ কথার উত্তরে রায় ব'লেছিল, বিচার ক'রতে কি সকলেই পারে নীলিমাদেবী। সাধারণ মানুষ আমরা, আমরা বিচার করি শুধু নিজেদের দিকটা চিন্তা করেই, কিন্তু তাকে তো বিচার বলেনা। নিজেকে অপরাধীর আসনে রেখে অপরাধীর সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক এবং অন্তরের অবস্থা চিন্তা ক'রে যে বিচার ক'রতে পারে সে-ই তো বিচারক।

আপনিও তা' পারেন······

নীলিমা এখন বুঝতে পারেনা এ কথাটা সে ব'লেছিল কি ক'রে ! বলার সময় তেমন কিছু তো সে চিন্তা করেনি কিন্তু রায় যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে ব'লল, আমার উপর আপনার এই বিশ্বাসের কারণ কি বলুন দেখি ?—তখন তার সেই কথা ও দৃষ্টিতেই নীলিমা প্রথম বুঝতে পারল যে সে তার সীমা অতিক্রম ক'রে অনেক দূরেই এগিয়ে পড়েছে।

তন্দ্রার ঘোরে নীলিমা শুধু সেই কথাটাই চিন্তা ক'রতে লাগল। এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল ? এর অর্থ কি ? আবার মনে হ'ল—সুধাবাবুর সঙ্গে অমনি ক'রে দেখা করাটা কি ঠিক হ'য়েছে !

এমনি সব খণ্ড ছিন্ন কতো চিন্তা তার মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল, তারপর এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের সেই ঘটনার সময় নীলিমা যদি আরও অনেক কিছু লক্ষ্য ক'রবার ও জানবার সুযোগ পেত তবে পরে তাদের চিরন্তনী সভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি মনোনয়নে এমনি মতান্তর ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'তনা !

কথা ছিল সকালেই নীলিমা ফিরে আসবে কিন্তু তিনটা বেজে গেল তখনও তাকে ফিরতে না দেখে রেবা উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল।

নীলিমার সম্বন্ধে যাকে সে প্রশ্ন করে সেই বলে সে কিছু জানেনা। "কমন-রুমে' সকলেই আছে, নাই শুধু লীলা আর নীলিমা।

রেবার অনুসন্ধানে অমলা ব'লল : নীলিমার সংবাদ তার 'পার্‌ট্‌নার'কে জিজ্ঞাসা ক'রলেই পার।

'পার্‌ট্‌নার' আবার কে এলো ?

নিভা চট্‌ ক'রে উত্তর দিল : কেন ! আমাদের লী !

সে আবার কিসের 'পার্‌ট্‌নার' হল ?

'পার্‌ট্‌নার' না হ'ক্‌, ঐ যে, কি বলে···'রুম-মেট' !

হেসে রেবা ব'লল : ওঃ ! তোরা সবাই যে দেখছি আজকাল কবিতায় কথা ব'ল্‌তে সুরু করেছিস ! একেবারে দ্ব্যর্থক !

ব'লে রেবা লীলার উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পেছন হ'তে অমলা ব'লল : তা' নইলে তোমাদের সঙ্গে মানাবে কি ক'রে রে'দি ! তোমাদের 'সাক্‌সেসর' তো আমরাই ?

হেনা ব'লল : আর মে'দি ! রেদি এখন চিরন্তনী নিয়েই অস্থির !

ডলি ব'লল : যাই তোরা বলিসনা কেন, রেদি যদি ঐ স্থ'টার মত 'স্কোপ' পেত, তবে সত্যি সত্যিই ও একটা-কিছু কাজের মত কাজ ক'রতে পারত।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে হেনা ব'লল : কর তোমরা সকলে একটা কেন হাজারটা কাজের মত কাজ, আমাদের দেখে শুনেই সুখ।

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল : হটাৎ এই খেদোক্তির কারণ ?

উত্তর দিল অমলা : কারণটা বোধ হয় আমাদের সকলেরই সমান।

সেক্‌স্‌পিয়র, শেলি, বায়রন সকলেই হয়তো থাকবে শিকায় তোলা, বড় জোর ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর বেলায় রবীঠাকুরের দু'একটা ছড়ার জাবর কাটবার সুযোগ হতে পারে।

এ-কথায় কা'র মনে কি হ'ল কে জানে কিন্তু মুখ ফুটে প্রদিবাদ ক'রতে সাহসও কারো হ'লনা।

ডলি ব'লল : তবে আমাদের মধ্যে কেবল লীরই সে ভয়টা কম।

উহুঁ! হেনা বাধা দিয়ে ব'লল : ভুল। আমার মনে হয় লীর বাবা ভয়ানক 'কন্‌সারভেটিব' আর বড্ড জেদী।

ডলি ব'লল : জেদী লীও কম নয়। ও বিষয়ে ও তিনটাই সমান। যেমন লী, নি, তেমনি রে। তবে রে দি আরও ভয়ানক। ও যা' ধরবে তার শেষ না দেখে ও ছাড়বেনা।

হেনা প্রশ্ন ক'রল : আচ্ছা, নি ?

ডলি উত্তর ক'রল : ও ভয়ানক চাপা···বাইরে থেকে কিচ্ছুটী বুঝবার উপায় নেই।

ঠিক, ঠিক, ব'লে সকলেই এ কথায় সম্মতি দিল।

রেবা আবার গিয়ে তার খাতা খুলে বসেছে কিন্তু খাতার মধ্যে মন বসতে চাচ্ছেনা, প্রতিটীক্ষণ সে আশা ক'রছে নীলিমার প্রত্যাগমনের।

লীলা নিজের খেয়ালে এঘর ওঘর ক'রে বেড়াতে বেড়াতে এসে উপস্থিত হ'ল নীলিমা যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরেই।

দরজা জানলা বন্ধ, ঘরের মধ্যে তাই অন্ধকারটা বেশ গভীর ব'লেই লীলার মনে হ'ল। হাত বাড়িয়ে আলোটা জেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে প'ড়ল ঘুমন্ত নীলিমার বুকের চাপে একটা খাতা। গভীর একটা ঔৎসুক্যে খাতাটা সে তুলে ধ'রল, সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাবান্তর হ'ল।

পেন্‌সিল দিয়ে একাধিক যায়গায় লেখা সুধারায়ের নাম। কোন কোনও লেখার উপর দিয়ে স্বেচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায়ই হ'ক পেন্‌সিলটা যেন একাধিকবার গতায়াত ক'রেছে। লীলা দেখতে লাগল গভীর আগ্রহে। কার লেখা ? নীর ব'লেই তো মনে হ'চ্ছে !

সহসা একখানি হাল্‌কা মেঘ চাঁদিমাকে এসে যেন গ্রাস ক'রল।

বুকের মাঝে রুদ্ধপ্রায় নিশ্বাসের সঙ্গে অনুভব করল লীলা একফালি নূতন অনুভূতি। ধীরে ধীরে নীলিমার পানে চোখ ফেরাতেই দেখে নীলিমা তার মুখের পানে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে।

নীলিমার বুকের মাঝে যদিও তখন জেগেছে একটা ঝড়ের দোলা কিন্তু মুখে তার কৌতুকভরা অনাবিল হাসির ছটা। লীলার সঙ্গে চোখের মিলন হ'তেই সে ব'লে উঠল : কেমন, কেমন জব্দ ! এবার ধরা প'ড়লে কি না চাঁদ ?

হাল্কা মেঘ খানা মুহূর্ত্তেই স'রে গেল। খাতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লীলা নীলিমাকে জড়িয়ে ধ'রল দু'হাতে। তবেরে শয়তানী নটিনি !

ক্রমে সেইদিন এলো⋯সেই চিরন্তনী দিবস।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হ'তেই সহরের সমস্ত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সংবাদপত্র বিচিত্র সুরে এবং রসাল ভাষায় এই চিরন্তনীর ব্যাখ্যা সুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের তীব্র কটাক্ষে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেউই আর অক্ষত নাই।

মধুর, অম্লমধুর, তিক্ত, কটুতিক্ত, তার সঙ্গে আবার ব্যঙ্গ, কেউ বা নগ্ন কুৎসিত আবার কেউ বা পচ্ছন্ন কদর্য্য ভাবকে ধার করা ভদ্রতার মুখোস দিয়ে প্রচার করছেন এই 'চিরন্তনী'র সার মর্ম্ম।

সেদিন মেসের সামনে দিয়ে একটা লোক চলেছে কতগুলি 'চাবুক' বগলে চিৎকার ক'রতে ক'রতে : চিরন্তনী নামে হ'ল মেয়েদের⋯⋯

অবশিষ্ট মধুর শব্দগুলি আর উচ্চারণ করা হ'ল না, ডলি এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল : কি এ সব ?

আজ্ঞে চাবুক।···নেবেন আপনি ? পড়ে দেখুন··· ······

ব'লে সে চিৎকার ক'রে তার বাঁধা ছড়া ব'লতে যাচ্ছিল অতর্কিতে ডলির ধমক খেয়ে সে নীরব হ'ল।

ডলি ব'লল : আমি সবগুলিই নেব, আমার সঙ্গে এসো।

মেসে এসে সমস্ত বইগুলি কিনে নিয়ে ডলি তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তার ক্রোধ দেখে রেবা হেসেই অস্থির। ডলি কিন্তু তাতে আরও রেগে গেল।

তুমি যে হাসছো বড ! রাস্তা দিয়ে চলা যে এদের জ্বালায় দায় হ'য়ে উঠল।

হাসি চেপে রেবা ব'লল : কেন, আমি কি রাস্তায় চলিনা ?

হয়তো চোখ কাণ বন্ধ ক'রেই চল। আর, তোমার মত তো সকলেই হ'তে পারে না।

রেবা ব'লল : কাজ যদি সত্যিই ক'রতে হয় ডল্ তবে চোখ কাণ, ও দুটোকেই বন্ধ রাখতে হ'বে, বাইরের সমালোচনার দিক থেকে অবশ্য। তা না হ'লে চ'লবেনা। চল্লিশখানা চাবুক পুড়িয়ে কতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ? ক'লকাতায় এসব সব-জান্তা কাগজের অভাব নাই। ক'জনের মুখ তুমি বন্ধ ক'রতে পারবে ? আজকার দুর্মুখ দেখেছ ?

গম্ভীর স্বরে ডলি উত্তর ক'রল : দেখেছি, ঐ দুর্মুখকে আমি দেখব।

তার মানে ? তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি ?

এমনি সময় প্রায় সকল মেয়েই এসে সেখানে উপস্থিত হ'ল একসঙ্গে জটলা ক'রতে ক'রতে।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : ওটা আবার কি তোদের হাতে ? চতুর্মুখ নাকি ?

চতুর্মুখ নয়, শমন,—তোমার বাবার কাছ থেকে এসেছে। ব'লে নীলিমা একখানি চিঠি রেবার হাতে দিল। ডলি সৌৎসুক্যে ব'লল : পড়ো দেখি।

রেবা প'ড়ল : "দুর্মুখের সঙ্গে আমিও একমত। তাই তোমাকে লিখছি, অনতিবিলম্বে তুমি আমার কাছে চ'লে আসবে। যদি না আস তবে তোমার নিকট এই আমার শেষ চিঠি এবং আমাদের সকল সম্বন্ধ শেষ জেনো। ভবিষ্যতের জন্য আমাকে দায়ী ক'রনা। ইতি"— .

সকলের চেয়ে দুর্মুখের প্রতি আকর্ষণ ডলিরই বেশী। হেনার হাত থেকে সে তাই কাগজটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে প'ড়তে আরম্ভ ক'রল।

"কয়েকজন অপরিণামদর্শী ধনী যুবকের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকটী অকাল-পক্ক তরুণীর তরুণ মস্তিষ্ক থেকে রঙিন স্বপ্নের নেশার ঝোঁকে গজিয়ে উঠেছে এক অপূর্ব্ব খেয়াল। এই খেয়ালী সঙ্ঘের নাম ধাম সমস্তই আমরা জানি এবং প্রয়োজন হ'লে সময়মত সাধারণের গোচরে আনব।

যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীনা না-বালিকা পিতার বহু শ্রমোপার্জ্জিত অর্থধ্বংসে মেস ও হোস্‌টেলে ব'সে, তাদের খেয়ালের রঙিন অণলে বাঙালী-সংসারের সুখশান্তি যজ্ঞস্নাত ক'রছেন—সমগ্র জাতির হ'য়ে আমরা তাদের অনুরোধ ক'রছি একবার তাঁদের সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ফিরে গিয়ে দৈন্যের স্বাদ উপলব্ধি ক'রতে। আর সেই সঙ্গে তাদের পিতা এবং অভিবাবকদেরও অনুরোধ ক'রছি, ( যদি তাদের পিতৃত্বের দাবী এখনও থেকে থাকে ) এই সব মেয়েদের গৃহে অথবা রাঁচিতে স্থানান্তরিত ক'রে সমাজ-সংসারের এই মহা বিপ্লবকে প্রশমিত ক'রবার চেষ্টা করুন।"

'ননসেন্‌স্‌'! ব'লে ডলি দুহাতে টেনে কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপর টুকরা টুকরা ক'রে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল।

রেবা উচ্চস্বরে হেসে উঠতেই ডলি ব'লল : হেসোনা, আমার সত্যিই গা জ্বালা করে।

গা জ্বলে, পোড়ে, আগুন তবুও পোড়ায়। ঐ জ্বালা এবং পোড়ানোতেই আগুণের পরিচয়।

ট্রাম এবং বাস বোঝাই কেরাণীকুল বাড়ী ফিরবার মুখে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসেই কেমন যেন আত্মবিস্মৃত হ'য়ে যায়। ছেলের বায়না মেটাতে উদরের বায়নাকে অগ্রাহ্য ক'রে যে পয়সাটী পকেটের এক কোণে একটী মাণিকের মূল্য নিয়ে বিরাজ ক'রছিল, এখন নির্ব্বিচারে সেটী আত্মবিক্রয় করে হকারের কাছে।

পাশ থেকে অনেকগুলি মাথাই এসে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানির উপর। দূরের কেউ কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে বলেন: একটু বড় ক'রেই পড়ুন না মশাই।

কেউ বলেন: এই সুযোগে সকাল বিকালে কিছু কাগজ ফেরি ক'রলেও বোধ হয় পনের দিনের বাজার খরচটা উঠতো।

হকার ছোকরাটী তখন গভীর উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার ক'রছে: "আর দেরী নাই, দিন তারিখ সব স্থির। আসুন, আসুন বাঙলার নারীগণ! সকলেরই সমান অধিকার। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে আসুন সকলে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানস্থলে, আসুন আপনাদের চিরন্তন অধিকার লাভের গর্ব্বে, উন্নত মস্তকে, উদ্যত হস্তে, ত্রস্ত পাদক্ষেপে—আসুন আপনাদের শাশ্বত অধিকার লাভের জন্য এই পূত যজ্ঞক্ষেত্রে···এসে ধন্য হউন, ধন্য করুন অধঃপতিত এই দেশকে···জাতিকে।"···ইত্যাদি···

দেখে শুনে মেয়েরা হ'য়ে উঠেছে সব মরিয়া। পূর্ব্ব হতেই যারা দূরে দূরে ছিল, দুর্ম্মুখের মুখরতায় তারাও এসে এক এক ক'রে যোগ দিতে লাগল। অধিবেশন যে তাদের সাফল্য মণ্ডিত হবে সে বিষয়ে রেবা, লীলা, নীলিমা

থেকে আরম্ভ ক'রে কারোরই আর সন্দেহ রইলনা। শুধু মাত্র একটা কারণ সকলকেই অন্তরে অন্তরে দিচ্ছিল পীড়া।

পরিস্কার রূপে সোজাসুজি কেউ কিছু না ব'ললেও সুধা রায়ের অভাবটা সকলেই যেন বোধ ক'রছিল, বিশেষ ক'রে রেবা। তার এই কীর্ত্তি, এ যে সুধা রায়েরই পরিকল্পনা। এ-সমস্ত কার্য্যের ধারণাও তো তার মাথায় আসেনি কখনও। সুধারায়ই তো প্রতিবারের সাক্ষাতে এমন একটা কিছু ক'রবার জন্য তাকে উৎসাহিত ক'রেছেন, আর আজ সত্য সত্যই যখন সে কাজে হাত দিল তখন থেকেই তার কোনও সংবাদ নাই। রেবা যে কতোবার···কতো দিন সুধা রায়ের বাড়ীতে খোঁজ নিতে গিয়েছে···তার সন্ধান কে রাখে! এই বিরাট উৎসবে সুধা রায় থাকবেনা, এ যে রেবা কল্পনাও ক'রতে পারেনা।

রেবা ভাবে পিনাক রায়কে সভাপতি করাই হয়তো সুধাবাবুর এই অন্তর্দ্ধানের একমাত্র কারণ। রাগ হয় তার বিজন বোসের উপর, অভিমান হয় সুলেখার উপর—কিন্তু উপায় কি?

রেবা জানে সে যদি স'রে দাঁড়ায় তবে এ চিরন্তনীর আয়োজন সমস্তই নিষ্ফল হবে, কিন্তু তা'তো সে চায় না। এই চিরন্তনী সমিতিকে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান ক'রে গ'ড়ে তোলাই যে তার অন্তরের একাগ্র ইচ্ছা। কিন্তু হায়! কে তাকে ঠিক সুধারায়ের মত শক্তি দিতে পারবে? বিজন বোস অর্থ সাহায্য ক'রছেন, আরও ক'রতে পারেন হয়তো, কিন্তু সে-ই কি সব? একটী-মাত্র অধিবেশনে নেতৃত্ব করা ভিন্ন পিনাক আর কি ক'রতে পারে! অথচ—রেবার মনে হ'ল সুধা রায়ের প্রত্যেক ব্যঙ্গটী পর্য্যন্ত কেমন অর্থপূর্ণ, কেমন তীক্ষ্ণ!—তার কাছে পিনাক!

লীলাও ক'দিন ধরে কতকটা এমনিই চিন্তা করছিল, তবে তার চিন্তা এমন ব্যাপক নয়, সে চিন্তা তার সম্পূর্ণ একার। সে ভাবছিল, হয়তো আবার দেখা হবে। রেবার বন্ধু যখন, তখন নিশ্চয়ই রেবা তাকে 'ইন্‌ভাইট' ক'রবে।

লীলা স্বপ্নেও মনে ক'রতে পারেনি যে রেবাও তাকে হারিয়ে ফেলেছে এমনি ক'রে।

রেবা নীলিমার মুখে তার নতুন বাসার খোঁজ পেয়ে সেখানেও ছুটতে বাধা করেনি কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, সেখানে গিয়ে শুনল যে সুধারায় ব'লে সেখানে কেউ থাকেনা।

রেবা ব'লল: কিন্তু মাস দুই আগেও তো এখানে ছিলেন ব'লে শুনেছি।

নিরাশ করা উত্তর—না কোনও দিনই ও-নামে কেউ এখানে ছিলেন না।

কিছু বুঝতে না পেরে রেবা ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে আসে।

নীলিমা ব'লল: লালিমাদির বাড়ীর সামনেই সে মেস তাই আমি সেখানে আর যাবনা, নইলে প্রমাণ ক'রে দিতাম তিনি সেখানে ছিলেন কি না।

রেবা ব'লল: তুই হয়তো কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস।

নীলিমা তখন আমূল সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে ব'লে পরে ব'লল: আমার সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে তিনি এই মেসের দরজা পর্য্যন্ত এসেছিলেন, আর আমি ভুল ক'রলাম!

এ কথায় রেবার মনে বেশ একটু অভিমান জাগল। ব'লল: মেসের দরজা পর্য্যন্ত আসতে পারলেন আর আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে পারলেন না তিনি?

নীলিমা ব'লল: আমি সেকথা বলেছিলাম কিন্তু কি একটা কাজের তাড়া ছিল ব'লেই আসতে পারলেন না। ব'ললেন, রেবাদেবীকে ব'লবেন, আর একদিন যদি সময় পাই, দেখা ক'রব।—আজ যেন কিছু মনে না করেন।

রেবা চেপে ধ'রল: তবে এতোদিন এ-কথা বলিসনি কেন?

নীলিমা নীরব। রেবা ব'লল: কি? কথা বলছিস না যে! এতোদিন সব চেপে ছিলি কেন?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মৃদু হাসির সঙ্গে নীলিমা ব'লল: সত্যি কথা ব'ললে বিশ্বাস করবে?

তোর কি মনে হয়?—রেবাকে তুই এতদিনেই চিনলিনা নি! নইলে আমার কাছে করিস তুই গোপন! রায়ের সঙ্গে আমার যে কী সম্বন্ধ তা তোর চেয়ে বেশী কেউ জানে কি?

নীলিমার মনে হ'ল লীলার কথা। ব'লল সে: তবে সত্যি কথা শোন। গোপন করার উদ্দেশ্য নিয়েই যে আমি গোপন ক'রেছিলাম তা' নয়। প্রথম কয়েকটা দিন একথা তোমায় ব'লব ভেবেছি, অনেক সময় চেষ্টাও ক'রেছি কিন্তু কি জানি কেন ব'লে উঠতে পারিনি। তারপর যখন বেশ কিছুদিন চ'লে গেল তখন বলার কথাটা একেবারেই গেলাম ভুলে।

নীলিমার কথার ধরণে রেবা হেসে ব'লল: বা:! বেশ উত্তর দিলি যা হ'ক। এসব কথা এক মানায় উকিল ব্যারিষ্টারের মুখে আর না হয় প্রেমিকের মুখে, দোষী আসামীর জবাবে এ মোটেই নয়।

যাই হ'ক সুধারায়কে নেমন্তন্ন করা কারো ভাগ্যেই আর ঘ'টে উঠল না; আর, এদিকে সুলেখার মুখে পিনাকের উচ্ছসিত প্রশংসা শুনতে শুনতে সকল মেয়েরাই আজকাল ভাবে, এর চেয়ে বধির হওয়া হয়তো ছিল ভাল।

তারপর সত্য সত্যই একদিন বিজন বোসের প্রসাদোপম অট্টালিকার দোরে রৌসিন চৌকি বেজে উঠে সমস্ত পাড়াকে সচকিত ক'রে তুললো। পথচারী সব সবিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখে বড় রাস্তা থেকে সরু যে গলিটুকু বিজনবোসের প্রাসাদের দোরে এসে মাথা দিয়ে শেষ হ'য়ে গিয়েছে, সেই গোটা রাস্তাটা সমস্তই সদ্য রক্ত প্রস্তর গাঁথা, দু'হাত উঁচু

ক'রে দু'দিকের দেয়ালও তেমনি। মাঝে মাঝে তার সুনিপুণ শিল্প-নিদর্শন,—পেখম তুলে ময়ুর, ফণা তুলে সর্প, উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মৃগ।

দক্ষিণে ও বামে দু সারি কদলীবৃক্ষ, পাদদেশে দুগ্ধ পরিপূর্ণ মৃৎকুম্ভ নারিকেল শিরে সুশোভিত। কদলীবৃক্ষকে জড়িয়ে র'য়েছে নানাপ্রাকর সরুলতা।

সদরে সর্ব্বক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে দু'টী দরোয়ান। তাদের পশ্চাতে রেখে অগ্রসর হ'তেই দক্ষিণে ও বামে দুটী মার্ব্বেল মূর্ত্তি—উর্ব্বশী ও কিন্নরী যেন মালা হস্তে এসে দাঁড়িয়েছে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য।

তারপরই বিরাট প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত নানাপ্রকার ফুল ও পাতাবাহারের টব। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটী ফোয়ারা হ'তে জলকণা অতি মৃদু নিস্বরণে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে,—যেন তরল কুজ্ঝটিকা। ত্রিতল সমান উঁচুতে বিশাল নীল চাঁদোয়া। তার বুকে জ্বলছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলো……যেন নীল আকাশের বুকে তারকার হার। চতুর্দ্দিকে চাঁদোয়া হ'তে বেয়ে নেমেছে সরু রেশমী ঝালর আর তার সঙ্গে আইভি লতা।

ফোয়ারা হ'তে পঞ্চাশ গজ দূরেই সুসজ্জিত মঞ্চ। মঞ্চের বিপরিত দিক হ'তে তাকে সম্মুখীন ক'রে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে এসেছে সরু মেহগ্‌নী কাটের চেয়ার। দু'তিনখানি চেয়ারের ফাঁকে ফাঁকে একটী ক'রে 'টি-পয়'। 'টি-পয়ের' উপর ফুলদানিতে টাটকা ফুলের তোড়া এবং একটা ক'রে 'য়্যাস্‌-ট্রে'।

ফুলেব সুবাসে চতুর্দ্দিক যেন নেশাগ্রস্থ। দেয়ালে দেয়ালে সজ্জিত নানাপ্রকার ছবি, এবং তৈলচিত্র।

কোথায়ো ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামানব শ্রীকৃষ্ণ, কোথায়ো পঞ্চ পাণ্ডব, শতভাই কৌরব, কোথায়ো আবার সূর্য্যাস্তবরত কর্ণ, আবার কোথায়ো দ্রোপদীর স্বয়ম্বর সভা, আবার উত্তরার শিক্ষাগারে বৃহন্নলাবেশী নৃত্য-শিক্ষক মহাবীর পার্থ। অপর একস্থানে শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করছেন।…

চিত্র দেখতে দেখতে মেয়েরা বিস্ময়ে সব নির্ব্বাক হ'য়ে রইল আর সুলেখা বিজয়িনীর মত একটার পর একটী ক'রে সকল চিত্রগুলিই বন্ধুদের দেখাতে লাগল।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুলেখা ব'লল: এখানা দেখছিস? আমার মতে সবচেয়ে ভাল এখানাই।

মেয়েরা এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল। সত্যই এ যেন ছবি নয়, ছবির চেয়ে সত্য কিছু।

অনুসূয়া প্রিয়ংবদা সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা ক'রছেন। কন্ব দু'হাত তুলে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন কিন্তু তার চোখে যেন কুয়াশার ঘনঘটা; গৌতমীর চোখেও জল। সহকার মঞ্জুরি মালা বিরহব্যথায় শুষ্কপ্রায়। মৃগশাবকটী দীন নয়নে শকুন্তলার মুখের পানে চেয়ে আছে। শকুন্তলার অন্তরও যেন আশু মিলন-বিরহের আশঙ্কায় ঈষৎ চঞ্চল। কন্বের উপদেশও যেন তিনি স্থির চিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না……ছবিতে ফুটে উঠেছে তার প্রতিটী ভাব-লেখা।

লীলা বিস্ময়ে ব'লে উঠল: একি ছবি না সত্যিই ·····

সুলেখার অতর্কিত আঘাতে লীলা সহসা স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

সত্যি না তো কি? একি তোর সুধা রায় রে?

রেবা সুলেখার গণ্ডে মৃদু আঘাত ক'রে ব'লল: দেখ সু', একজনের গুণ গাইছিস, গা, কেউ তাতে তোর মত হিংসা ক'রছেনা কিন্তু আর একজন অচেনা ভদ্রলোকের মাথা খাচ্ছিস কেন? যাই বলিস তুই, এতে তোর সুরুচির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না।

সত্যিই, সুলেখার এ যেন একটা স্বভাবই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। সুযোগ পেলেই ও আমাদের মারফৎই সুধাবাবুকে একটা ছোবল মারবে। কিন্তু, কই? আমরা তো কখনো তোর পিনাকবাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলি না।

নীলিমার কথায় লীলা ব'লল : কিন্তু ওর সেই ছোবলে যে কোন্ ভাবের ঝাঁঝ্ পাওয়া যায় তা' তো বুঝতেই পারো।

সুলেখা ব'লল : কি রকম ?

কি রকম আবার কি ? আমি 'বেট' রেখে ব'লতে পারি যদি কখনও সুধাবাবুর সঙ্গে তোর পরিচয় হয়, তবে নিশ্চয়ই তুই তার প্রেমে পড়বি।

কপট কোপের সঙ্গে সুলেখা ব'লল : ঈশ্ ! এতোই ?

রেবা হেসে ব'লল : আমি কিন্তু আজকাল একটা কথা ভেবে মনে মনেই হাসি। সুলেখা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে রেবার পানে তাকাল।

—মনে আছে তোর সে-দিনের কথা ?

সুলেখা জিজ্ঞাসা ক'রল : কি কথা বল তো ?

রেবা ব'লল : একদিন বড় গলায় বলেছিলি না···প্রেম মানেই পাপ ? আর আজ ?

লীলা ব'লল : আরে ও কি আর নিজের কথা ব'লেছিল ! ওটা নেহাৎ তোমাদেরই জন্য······আমাদের পুরুত ঠাকুরদের বিধান দেবার মত।

কথা ব'লতে ব'লতে সুলেখা সমস্ত ঘর বাড়ী বন্ধুদের দেখাচ্ছিল।

এটা আমার শোবার ঘর, ওটা ওঁর। আর, এ দুটী ব'সবার, ঐ অমনিই, ওঁর একটা আমার একটা···মাঝে এই দরজা।

লীলা ব'লে উঠল : চমৎকার ! ঠিক যেন এ যুগের পুরুষ ও নারীর সংগ্রাম !

সকলেই জিজ্ঞাসা ক'রল : কি রকম ? কি রকম ?

লীলা উত্তর ক'রল : দেখনা, কেউই কারো মুখ তাকাবেন না, তোয়াক্কা রাখবেননা, সবই পৃথক পৃথক, আবার উভয়েরই উভয়কে চাই। মাঝখানে এই ইটের পাঁচিল আবার তার মাঝেই প্রয়োজনের ঐ গোপন দরজাটুকু !

লীলার কথায় সকলেই হেসে উঠল।

সুলেখা ব'লল : তা ভাই কি করব! ওঁর বন্ধুবান্ধব তো সব তোর মত নয়! তারা বেটা ছেলে, তারা থাকবে ও ঘরে আর আমি—

তুমি অবলা কুলবালা, তা' জানি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ভাব ক'রতেও তো তুমি পিছু হটনা! সাধ্য থাকে ঐ দরজা একেবারেই বন্ধ ক'রে দাও, —নইলে ঐ গোপন পশুবৃত্তি কেন?

লীলার কথা সকলেই উপভোগ করছিল।

সুলেখা বিপন্নের মত ব'লল : না, লী আজকাল দেখছি বে'র উপযুক্ত শিষ্যাই হ'য়েছে!

ঐ সব গুরুশিষ্য আমি বুঝিনা। পশুত্বকে পারবনা উপেক্ষা ক'রতে আর ভড়ং দেখিয়ে মানবত্বকে ক'রবো ঠাট্টা···এ আমি বরদাস্ত ক'রতে পারিনা।

লীলার কথায় রেবা বুঝল যে সে অনেক দিনের অনেক কথার উত্তরই সুলেখাকে দিল আজ. কিন্তু সুলেখা কিছু বুঝতে পারল ব'লে তার মনে হ'লনা। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার জন্য হাত ঘড়িটার পানে তাকিয়ে সহসা সে ব'লে উঠলো : না, আর ঝগড়া করবার সময় নাই। নিচে গিয়ে যে যার কাজে লেগে পড।

ব'লেই সে সোজা নিচে নেমে এলো।

নিচে তখন বেশ ভীড় জমেছে। প্রায় সকল 'স্কুলের' 'মিস্ট্রেস' এবং ছাত্রীরাই এসে প'ড়েছে, অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ মিস্ বিপুলা বোস, নীহার নাগ, মিস্ জগত্তারিণী সাঁড়েল, অনুরাগ কর, অটল নন্দী, প্রদ্যুম্ন হালদার · এক কথায় সহরের এক-ডাকের পরিচিত সকলেই উপস্থিত।

মিস্ বিপুলা বোসের দেহখানি চিরদিনই একটু স্থুল এবং তার জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণই বিমর্ষ। ইদানীং তাই তিনি ভাত ছেড়ে রুটী ধ'রেছেন। মাত্র এই পঞ্চত্রিশ বৎসর বয়সেই আড়াই মন দেহ সত্যই তাঁর উদ্দীপনাময় জীবনকে ক'রে তুলেছে বিড়ম্বিত।

সহরের সকল কাজেই তিনি আছেন কিন্তু ইদানীং দেহের স্থূলত্বের জন্য সভা-সমিতিতে যাওয়া-আসা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে উপস্থিত দেখে রেবা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

মিস্ বোস দূরে বিজন বোসকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং একটু অনাবশ্যক জোরেই তার দিকে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু আজ-কালের মেয়েগুলি যেন কেমন! ভীড় না জমিয়ে, জটলা না ক'রে তারা যেন সরতে দাঁড়াতেই জানেনা। মিস বোস তাদের পাশ কাটাতে চেষ্টা ক'রলেন, সঙ্গে সঙ্গে টি-পয়টা' যে কেমন ক'রে উল্‌টে প'ড়ল তা' তিনি বুঝতে পারলেন না। ফুলদানিটা মাটিতে পড়ে' গেল, হয়তো তিনিও তার অনুসরণ ক'রতেন কিন্তু রেবা এসে তাকে ধ'রে ফেলল, অবশ্য রেবাকেও বাঁ' হাতে তার পাশের চেয়ারটা চেপে ধ'রতে হ'য়েছিল।

রেবার চিবুকখানি সস্নেহে নেড়ে দিয়ে মিস্ বোস ব'ললেন: আর ভাই, এম্‌নি বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো! সাধে কি আর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি! আব পেরে উঠিনা!

রেবা ব'লল: সত্যিই, আপনি যে আসতে পারবেন, এ আমি আশা করিনি। কী আনন্দই যে হচ্ছে আপনাকে দেখে! তা' কেমন আছেন আজকাল?

মিস্ বোস রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ব'ললেন: কেমন তা' তো নিজের চোখেই দেখলে। তবে কিনা, তোমাদের এই আন্তরিক আকর্ষন, একে উপেক্ষা ক'রতে কিছুতেই পারলাম না। ভাবলাম পোড়া শরীর তো এমনিই চিরকাল; তার জন্য কর্ত্তব্যের অবহেলা আর কতো করব! বিশেষ, যে কাজে আজ তুমি হাত দিয়েছ তাতে তোমাকে একবার প্রশংসা না ক'রেও থাকতে পারলাম না। আর, তুমি হাত দিয়েছ ব'লেই যে একাজ তোমার একার, তা তো নয়;—এ যে আমাদের সকলেরই কাজ।

গভীর কৃতজ্ঞতায় রেবা ব'লল: আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই আশা করি। হুজুগের ঝোঁকে হাত দিয়ে বসেছি, এখন যদি আপনাদের উপদেশ না পাই; তা' হ'লে যে আমরা কিছুই ক'রতে পারবনা!

মিস্ বোস রেবাকে সমর্থন ক'রে ব'ললেন: হ্যাঁ ঠিকই তো! আর এ-কাজে ফাঁকী থাকলে চ'লবেনা। বাংলার প্রত্যেক নারীরই এতে কিছু না কিছু দেবার ও ক'রবার আছে। যদি কোন রকমে একবার দাঁড়াতে পারো তবে এই প্রতিষ্ঠান যে কী হ'বে সে কথা ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে! তা' তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না! ব'লে রেবার হাত ধ'রে টেনে পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে আবার ব'ললেন: বয়সে আমি তোমার অনেক বড়, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি রেবা, তুমি সুখী হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ব'লে রেবার পিঠের উপর তার একখানি হাত রাখলেন।

রেবাও সঙ্গে সঙ্গে নিচু হ'য়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে ব'লল: আপনার আশীর্ব্বাদ! আচ্ছা। আপনি বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

রেবাকে বাধা দিয়ে মিস্ বোস ব'ললেন: না চা আর খাবো না। আচ্ছা, এই খবরের কাগজওয়ালাদের কি মাথা খারাপ হ'য়েছে না কি? সকলেরই যেন গাত্রদাহ আরম্ভ হয়েছে! কেনরে বাপু?

হেসে রেবা ব'লল: আমি আর কি বলব! আপনারাই দেখুন।

এমনি সময় ডলি এসে দাঁড়াল সেখানে। রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: কি রে ডল্! কাকে খুঁজছিস?

ডলি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি চুপি ব'লল: তুম্মু'খ আসেনি?

এসেছে নিশ্চয়ই, খুঁজে দেখ। ঐ 'রো'টা কাগজওয়ালাদের।

আঙুল দিয়ে সে দূরে নির্দ্দেশ ক'রল।

ডলি চ'লে যেতেই ছুটে এলো ব্যাস্ত সমস্ত হ'য়ে সুলেখা।

হ্যাঁরে রে! তোদের সুধাবাবুকে 'ইন্‌ভাইট' ক'রেছিলি?

সুলেখার মুখে সুধা রায়ের নাম শুনে রেবা বিস্মিত হ'ল। জিজ্ঞাসা ক'রল: কেন, বল দেখি?

রেবার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা পাশের চেয়ারটার উপর ঝুপ ক'রে বসে প'ড়ল। তার গম্ভীর বিষন্ন মুখের পানে তাকিয়ে রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: সুধাবাবুর খোঁজ করছিস কেন?

সুলেখা ব'লতে লাগল: সে-দিন কোন্ পদ্মার পার না কোত্থেকে একটা টেলিগ্রাফ এসে উপস্থিত। আমি পঞ্চাশবার নিষেধ ক'রলাম, তবুও তিনি গেলেনই। কাল রাত্রে তার ফিরবার কথা তাতে আজ, এখনও তার দেখা নাই। এখন কি করি বল্ তো?

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: কার কথা ব'লছিস তুই?

আর কার? পিনাক বাবুর।

এঁ্যা! রেবার মনে হ'ল তার এতোদিনের আয়োজন, এতো সাধ সমস্তই যেন মুহূর্ত্তে শেষ হ'য়ে গেল। তার সম্মুখেই একটা বিশাল গহ্বর যেন মুখব্যাদান ক'রে অপেক্ষা ক'রছে। মনে হ'ল তার দুর্ম্মুখের কথা, চোখের সামনে ভেসে উঠল—রাস্তায় রাস্তায় 'হকার' চীৎকার ক'রে প্রচার ক'রছে তার এই চিরন্তনীর অসাফল্যের কথা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: বিজন বাবু কোথায়?

সুলেখা উত্তর ক'রল: শিয়ালদা স্‌টেশনে গিয়েছেন। আজ ভোরের ট্রেনেও আমরা তাকে আশা করছিলাম কিন্তু......

সুলেখার কথা শেষ হ'লনা, শুষ্কমুখে বিজন এসে সেখানে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা ক'রতে যেন তার ভয় হচ্ছিল তবুও সুলেখা জিজ্ঞাসা ক'রল: কি হ'ল?

আর কি? বুঝতেই পারছ!

বিজন চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল :—সর্ব্বনাশ ! আর দেরী করা সম্ভব নয়।

সুলেখা ব'লল : কিন্তু দেরী না ক'রে করবেই বা কি ?

বিপুলা বোস এতক্ষণ ধ'রে সমস্ত শুনছিলেন, এবার তিনি রেবার পানে চেয়ে ব'ললেন : আর কাউকে দিয়েই না হয় কাজটা আরম্ভ করিয়ে দাও, নইলে বড়ই কেলেঙ্কারী হবে।

সত্যই তখন চতুর্দ্দিকের মৃদু গুঞ্জরণ ক্রমেই বেড়ে উঠছে দেখে রেবা বিজনকে ডেকে দিয়ে অন্তরালে চ'লে গেল। মিস বোস সুলেখাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন : আজ কি তিনি কোন মতেই আসতে পারবেন না।

কি ক'রে আর বলি বলুন ? ট্রেন তো আরও আছে কিন্তু তাঁর আসার বিশ্বাস কি ?

এমনি সময় রেবার ইঙ্গিতে সুলেখাও উঠে গেল।

কিছু সময়ের মধ্যেই দেখা গেল রেবা সুলেখা থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত মেয়েরাই প্রাঙ্গনে নেমে আসছে সারি বেঁধে। হাতে তাদের সকলেরই একখানা ক'রে ফলের ডিস, তাদের পেছনে চায়ের কাপ ও কেটলী নিয়ে প্রায় দশটী ছেলে।

সভার চঞ্চলতা যেন একটু অবসর নিল।

এক কোণে দুটী মেয়ে তখন মহা উৎসাহের সঙ্গে এই চিরন্তনীর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছে।

যাক্‌, এ বিষয়ে তোমার নিজের কি মত তাই বল কল্পনা।

কল্পনা হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে উত্তর ক'রল : এযুগে এ বিষয়ে কি আর মতভেদ হ'তে পারে পূর্ণা ? আমার মতে পুরুষের পক্ষে যা শোভা পায় নারীর

পক্ষেও তা অশোভন নয়। আমি ভাই চিরদিনই খোলাখুলির পক্ষপাতী। আমার মন যা' চায়···সুযোগ পেলে আমি তা' নির্ব্বিচারে ক'রে থাকি।

পূর্ণা জিজ্ঞাসা ক'রল : তা' কি করছ আজকাল ?

কি আর ক'রব ভাই ! করছি একটা 'হস্‌পিটালে' 'নার্সের' কাজ, খাচ্ছি ছেলেদের মাথা আর হাত খরচা চালাচ্ছে তাদেরই পকেট।

ব'লে কল্পনা এক অত্যদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল।

পূর্ণা জিজ্ঞাসা ক'রল : কাজ কর্ম্ম কিছু শিখেছ কি ?

এই, এ-সবে যেটুকু দরকার তাই কোন মতে শিখেছি আর কি !

তবে চাকরিটা বাঁচাচ্ছ কি ক'রে ?

এদিক্ ওদিক্ একবার তাকিয়ে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে কল্পনা উত্তর ক'রল : নেহাৎ বয়সের জোরেই।

পূর্ণা জিজ্ঞাসা ক'রল : সে তো আর চিরকাল চ'লবেনা। এর পর কি করবে ? তখন যে একেবারেই ভাসতে হবে।

আবার সেই গা-জ্বালানো ফাজিল হাসি হেসে কল্পনা ব'লল : পাগল ! ভাসার আনন্দ আজই সইতে পারা যায়। অবশ্য এর মধ্যে দেখে শুনে একটা 'স্‌টেশন' ঠিক ক'রে নিতে হবে বৈ কি ! কোন্ ডাক্তার বন্ধুর কেমন পসার জমে সেটাও তো দেখা দরকার !

রঙ-চঙে কথা অনেকই তো ব'ললে কিন্তু এতোই কি সোজা ?

নাড়া পেয়ে ভাগাড়ের বিষাক্ত বাষ্প যেমন ক'রে ছড়ায় তেমনি ক'রেই কল্পনা প্রকাশ ক'রতে লাগল তার অন্তরের কলুষতা। পূর্ণাকে নীরব ক'রে দিয়ে সে ব'লে চলল : তুমি জানোনা আজ সুযোগ আমাদের কতো বেশী। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করা আজ আর তেমন কঠিন মোটেই নয়। সত্যি বলতে কি, আমাদের সামনেই যে ধাপটা আসছেনা ? সে দিনের কথা ভেবে আমার কিন্তু আজই হিংসা হচ্ছে।

পূর্ণা অতর্কিতে প্রশ্ন ক'রল : তোমাদের সামনে এখনও কোন ধাপ আছে নাকি বাকী ?

কল্পনা তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তার মুখের পানে তাকাল।

পূর্ণা ব'লল : আমি ভেবেছিলাম যে যত গুলি ধাপ আছে, সব কটাই তোমরা পার হ'য়ে এসেছো, সামনে আর ধাপ তোমদের নেই-ই !

তবে কি আছে ?

শুন্য···, একেবারে অন্ধকার যবনিকা।

তবে কি তুমি বলতে চাও যে আর আমাদের এগোন অসম্ভব, এখানেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকব ? আমাদের পরে যারা আসবে তারা তা হ'লে একেবারেই অচল ?

পূর্ণা ব'লল : না, অচল কেন হবে ! চলবে, তোমরা চললে ; তারাও চলবে। তবে তোমরা যে পথটা পেরিয়ে এলে, তারা বোধ হয় এখান থেকে আবার সেই পথ বেয়েই ফিরে যাবে······পেছনের দিকে। কারণ চ'লতে মানুষের হবেই, দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

কথাটা যেন কল্পনার কানে কেমন লাগল। মুহূর্ত্ত সময় সে পূর্ণার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল : তুমি কি ক'রছ আজকাল ? বে' তো করনি দেখছি।

না, এবার বি, এ, দেব···তবে 'প্রাইভেট'।

বাড়ীতে প্রাইভেট মাষ্টার নিশ্চয়ই আছে তবে ?

কল্পনার কথায় যে ইঙ্গিত ছিল সেটা বুঝতে পেরে পূর্ণার মুখের ভাব মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হ'ল। কিন্তু সে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে উত্তর ক'রল : হ্যাঁ, আছেন দু'জন।

নিশ্চয়ই কোন প্রফেসর ?

উত্তর দেবার প্রবৃত্তি আর ছিলনা পূর্ণার তবুও ব'লল : না, প্রফেসর কেউ নয়, একজন আমার বাবা আর একজন···পিনাক রায়।

পূর্ণার পাশ থেকে একটী মেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রল : কোন্ পিনাক রায় ?

পূর্ণা তার পানে মুখ ফিরিয়ে ব'লল : আজ এখানে যিনি সভাপতিত্ব ক'রবেন। আপনি তাকে চেনেন বুঝি ?

মেয়েটী কোনরূপ উত্তর দেবার পূর্ব্বেই কল্পনা জিজ্ঞাসা ক'রল : আপনি কে ? আপনাকে তো চিনলাম না।

মেয়েটী একটুখানি হেসে ব'লল : এখানকার এতো লোক, সকলকেই যখন চেনেন তখন আমার মত একজনকে না চিনলেই বা ক্ষতি কি ?

তবুও কল্পনা জিজ্ঞাসা ক'রল : আপনার নাম কি ? কোথায় থাকেন ?

মেয়েটী উত্তর ক'রল : নাম আমার ডালিম, থাকি মসজিদবাড়ী।

এমনি সময় চা পরিবেশনকারীগণ এসে পড়ায় তাদের আলাপ আলোচনা বন্ধ হ'ল, এবং এই সুযোগে পূর্ণা উঠে প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল।

খানিকটা দূরে এসে আসন লাভ ক'রেছেন আশুবাবু, রমন এবং হিতেন।

তারা তাদের সমস্যা নিয়েই ব্যাস্ত। কেউ বলছে : এ আমাদের মেসের সেই পিনাকই।

আবার একজন তার প্রতিবাদ ক'রে ব'লল : আরে দূর ! এও কি হতে পারে কখনও ! আর, সে তো শুনেছি ক'লকাতা ছেড়েই পালিয়েছে।

রমন ব'লল : চাঁদকে যে পালাতে হবে তা' আমি আগেই জানতাম। নেহাৎ আমরা দেখে···হ্যাঁ।

আশুবাবু সখেদে ব'ললেন : পালালো পালালো ; কমছে কম্ আমার পঞ্চাশটা টাকা মেরে নিয়ে পালালো !

মেসেরই অপর একটী ছাত্র মিনতির সুরে ব'লল : আপনারা একটু আস্তে

কথা বলুন, নইলে শেষটায় যদি মেয়েদের হাতে কাণমলা খেতে হয় তবে••••••

তার কথা শেষ না হ'তেই রমন ব'লে উঠল : ওঃ! সে ভারি রসাল! আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে আমায় দেখিয়ে দেবেন দাদা!

এমনি সময় দূরে নীলিমাকে দেখে রমনবাবু ইসারার সঙ্গে কি যেন একটা অভিমত প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, হিতেন বাধা দিয়ে ব'লল : চুপ। ও আমার শালী হয়রে।

দাঁতে জিভ কেটে রমন মাথাটা নিচু ক'রল।

বিজনের অবস্থা দেখে রেবার অন্তরের সেই প্রতিশোধ স্পৃহা মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বিজন যখন ভগ্ন কণ্ঠে তার কাছে এসে ব'লল : কি বলব রেবা দেবী, সবই হয়তো আমার অদৃষ্ট; নইলে আজ পর্য্যন্ত তার কথার নড়চড় হ'তে কখনো দেখিনি। সেদিন সে ব'লল, যেমন ক'রেই হ'ক তোমাদের কাজের দিনে আমাকে তোমরা পাবেই।

বিজন আর ব'লতে পারলনা। রেবা তার অবস্থা দেখে ব'লল : যাক্ যা হবার হয়েছে, এখন আপনিও অতটা উতলা হ'লে চলবে কেন? এখন কি করা যায়, তাই বলুন।

বিজন উত্তর ক'রল : আপনি যা পারেন করুন, আমার আর দাঁড়াবার অবস্থা নাই। ব'লেই সে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

ক্ষণপরে রেবা উঠে দাঁড়িয়ে বলল : উপস্থিত ভদ্র মহিলা এবং মহোদয়গণ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। বিশ্বজগতের এই অভ্যুদয়ের দিনে বাঙলার নারীগণ যখন তাদের চিরন্তণ অধিকার লাভের জন্য আপনাদের কাছে আবেদন জানাল তখন আপনারা সহৃদয়ে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের কৃতার্থ ক'রেছেন। নারীর চিরন্তন গৌরব ও সম্মান পুনরোদ্ধারে এই সমবেত

সহানুভূতি দানের জন্য সমস্ত নারীর প্রতিনিধি স্বরূপে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঘন ঘন করতালির শব্দ প্রসমিত হ'তেই রেবা ব'লল: কোনও দৈব ঘটনায় বাধ্য হ'য়েই আমাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় এখনও এসে সভায় উপস্থিত হ'তে পারেন নি, তবে এখও আমরা আশা করছি হয়তো তিনি শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমরা সভার পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্যের জন্য আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করছি।
রেবা নীরব হ'তে মিস্ বিপুলা বোস উঠে ব'ললেন: এই চিরন্তণীর উদ্যোক্তাগণকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শ্রীমতী রেবা দেবী যা' ব'ললেন, সে কথা যুক্তিপূর্ণ; তাই আমি তাঁকে সমর্থন করি।

মৃদু পিয়ানোধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের সম্মুখের পর্দ্দা সরে গেল।

প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত হ'ল কিন্তু সভাপতির অনুপস্থিতির জন্য সভাপতি-বরণের মালা সকলের সম্মতিতে মঞ্চের উপরই রাখা হ'ল। তারপর আরও কয়েকটী মেয়ের গান হবার পর প্রবেশ ক'রল লীলা।

নিস্তব্ধ সেই জন-সমুদ্রের বক্ষ আলোড়িত ক'রে ধীরে ধীরে জাগল তার স্বর...যেন সে সর্ব্বসহা ধরিত্রির বক্ষভেদী করুণধ্বনি:—

কোথা, কোথা,

কোথা আছ ওগো দেবতা?

তারপর কখন যে লীলার গান শেষ হ'য়ে মিলিয়ে গিয়েছে মৌন সমাধিতলে তা কেউ বুঝতে পারেনি। সহসা বিজনের উল্লাসধ্বনিতে সকলে তাকিয়ে দেখল একপাশে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পিনাক। কোনরূপ প্রতিবাদ ক'রবার পূর্ব্বেই বিজন তাকে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে এলো সভাপতির আসনের কাছে।

মেয়েরা সকলেই তখন বিস্ময়-স্তব্ধ! এই পিনাক? এযে সুধারায়!

নীলিমার মনে হ'ল লালিমাদের বাড়ীতে সেদিনের সে-কথা। সকলের চেয়ে বিস্মিত হ'ল সে-ই বেশী !

মুহূর্ত্তে বিজন হ'য়ে উঠেছে মরিয়া। চিৎকার ক'রে সে ব'লতে সুরু ক'রল : উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ ! ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা আমাদের সভাপতি মহাশয়কে ঠিক ইপ্সিত মুহূর্ত্তে পেয়ে গিয়েছি !

তারপর সহসা পাশে তাকিয়ে ব'লল : কই, কই, মালা কোথায় রাখলেন ?

রেবার মুখেও তখন হাসি ফুটেছে। মালা ঐ যে 'স্টেজের' উপরে র'য়েছে।

···নিয়ে আসুন। শীগ্‌গীর।

তারপর লীলার পানে দৃষ্টি প'ড়তেই বিজন চিৎকার ক'রে উঠল : দাঁড়িয়ে কি ক'রছেন ! ঐ মালাটা নিয়ে আসুন চট্ ক'রে !

লীলা স্তব্ধ, অভিভূত।

আবার বিজন চিৎকার ক'রে উঠল : কেন সময় নষ্ট ক'রছেন ? শীগ্‌গীর ক'রে সভাপতি বরণ ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রে দিন। অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে !

মন্ত্রাদিষ্টা লীলা যেন যন্ত্রচালিতের মত এসে মালা হস্তে দাঁড়াল পিনাকের সামনে। তখন তার বুকের মধ্যে হাতুরির ঘা পড়ছে একটার পর একটা। প্রত্যেক ধ্বনিটা সে তার উপলব্ধি ক'রছে। বিজন চিৎকার ক'রে ব'লল : আপনাদের সকলের সম্মতিক্রমে লীলাদেবী সভাপতি বরণ ক'রছেন।

বিজনের কথার ধরণে লীলার দুটী হাতই থর থর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ ক'রল। বিজন রেবার পানে তাকিয়ে ব'লল : ধরুন, ধরুন।

রেবা এসে দু'হাতে মালাটী ধরে লীলাকে সাহায্য ক'রল। চতুর্দ্দিকে আবার বেজে উঠল ঘন ঘন করতালি।

আশুবাবুর গা টিপে রমনবাবু ব'লল : আমি কি স্বপ্ন দেখছি না কি ! ওঃ ! একেই বলে বরাত !

আশুবাবু ব'ললেন : স্বপ্ন হ'লেও বাঁচোয়া ছিল, এ যে দেখছি সত্যি! নাঃ, দড়ি একটা কিনতেই হ'ল।

পেছন থেকে কে যেন ব'লল : কই আশুবাবু! আপনার পঞ্চাশ টাকা এবার চেয়ে নিন না।

একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাড়িয়ে ব'ললেন : যদি আপনারা অনুমতি দেন···তবে আমার একটা অনুরোধ ছিল বিজনবাবু।

বিজন উৎসাহের সঙ্গে ব'লল : নিশ্চয় নিশ্চয়! কি ব'লতে চান বলুন?

বৃদ্ধ ব'ললেন : লীলাদেবী যদি আর একখানা গান শোনাতেন·····

তার কথা শেষ না হ'তেই বিজন ব'লে উঠল : নিশ্চয়ই শোনাবেন। এ আর বেশী কথা কি?

রেবা কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ব'লল : একেবারে যে কল্পতরু হ'য়ে প'ড়লেন বিজনবাবু। লীলা আর গাইবে কি ক'রে? ওর যে শরীর ভয়ানক খারাপ। নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যই ওর ঐ একখানি গাওয়া।

বিজন ব'লল : তা হ'লে? আমি যে কথা দিয়ে ফেললাম!

লীলা দেখল এর পর আর আপত্তি করা সঙ্গত নয়। তাই সে রেবাকে ব'লল : আমার সঙ্গে এসো রেদি, নইলে আমি পারব না।

লীলা বসে গাইতে যাচ্ছিল, দূর হ'তে চিৎকার উঠল : অনুগ্রহ ক'রে দাঁড়িয়ে—

রেবা লীলার পাশে দাঁড়িয়ে ব'লল : কোনও ভয় নেই তোর, তুই গা', আমি দাঁড়িয়ে আছি।

লীলার বুকের ভিতর তখন কী যে হচ্ছিল তা কে জানে? গানের সঙ্গে সঙ্গে তার আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু দুটী আপনা হ'তেই মুদে এলো। অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগে সে গেয়ে চলল :

সে মোরে ডাকবে ওগো
ছিনু যে সেই আশাতে,

এ দুয়ার খুলবে আমার
তাহারই প্রথম হাতে।
প্রভাতের প্রথম পাখী গাহে যার বন্দনা গান,
নিশি জেগে বৃথাই কবি করে যার রূপের ধেয়ান !—
আজি সেই এই প্রভাতে
এলো মোর সুর-সভাতে।
গোপনের ধেয়ানখানি
মালা হ'ল তার গলাতে,
আজি মোর জয় সভাতে !!

গানের প্রতিটী পদ লক্ষ্য ক'রে রেবা মনে মনে হাসছিল, অন্তরালে নীলিমার অবস্থাও তাই। হেনা ডলিকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে ব'লল : চিরন্তণীর সার্থকতা ক'রে নিল লী-ই, আচ্ছা মেয়ে বটে !

লীলার গান শেষ হ'তেই চতুর্দ্দিক হ'তে চিৎকার উঠল, "আর একবার, দয়া ক'রে আর একবার।" কিন্তু আর কে গাইবে তখন ! গানের সঙ্গে সঙ্গে লীলার দেহখানি কাঁপছিল···যেন স্রোতের মুখে ক্ষীণ বেতস লতাটী। গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, রেবা দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রল। পদ্দা ফেলে দিয়ে মুখে চোখে জলের ধারা দিতে ক্রমে সে সুস্থ হ'ল।

সভাপতি মহাশয় সহসা উঠে ব'ললেন : কর্ম্মীদের মধ্যে একজন যখন এরূপ অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছেন তখন আমার মতে আজ সভা এখানেই শেষ করা উচিৎ। কারণ, যাঁরা এই চিরন্তণীর উদ্যোক্তা তাঁরা সকলেই থাকবেন আলোচনায় অনুপস্থিত সুতরাং সে-সভার কোন সার্থকতাই হ'তে পারে না।

মিস বোস সভাপতি মহাশয়কে সমর্থন ক'রে ব'ললেন : আমারও

মত তাই। শ্রীমতী রেবা দেবী, সুলেখা বোস, নীলিমা দেবী এদের মতামত না জেনে আমরা কিছুই ক'রতে পারি না।

মিস্ কল্পনা মুখার্জ্জি কিন্তু এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রল। মিস্ বোসের কথায় সে ব'লল: আপনারা কি তা' হ'লে একজনের জন্যই সভা বন্ধ ক'রতে চান? এতো সব মহিলা এবং ভদ্রলোক উপস্থিত থাকতেও একজনের অনুপস্থিতির এমন কি মূল্য থাকতে পারে?

মিস্ বোস ব'ললেন: কিন্তু সেই একজন যদি বিশেষ একজন হয়?

যারা এতটা 'নার্ভাস্', 'সেন্টিমেন্টাল' তাদের আমরা 'বিশেষ' ব'লে মানতে রাজী নই। এ যুগের নারী যারা, তাদের ঠিক এমনটা হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মিস্ কল্পনা মুখার্জ্জির কথায় মিস্ বিপুলা বোস সভাপতি মহাশয়ের দিকে চেয়ে ব'ললেন: এর উত্তর আমরা সভাপতি মশাইর কাছ থেকেই শুনতে চাই।

সভাপতি মহাশয় ব'ললেন: আমার চিরদিনের ধারনা, 'নার্ভ' যার থাকে সে-ই 'নার্ভাস' হয়, সে-ই হয় 'সেন্টিমেন্টাল'। এতে লজ্জা বা অপৌরুষের কিছু থাকতে পারে ব'লে আমার মনে হয় না।

তাই যদি তবে আজ আমাদের এই চিরস্তুণী ক'রবার আবশ্যক কি?

কল্পনার এ কথায় সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন ক'রলেন: আপনার কথা থেকে আমি কি তবে এই বুঝবো যে এই চিরস্তুণী ক'রে আপনারা আজ নারীত্বকে উপেক্ষা ক'রতে চান?

এ কথায় চতুর্দ্দিকে আবার গুঞ্জরণ আরম্ভ হ'ল।

কল্পনা মুখার্জ্জি উত্তর ক'রল: হ্যাঁ, ঠিক অমন না হ'লেও কতকটা তাই-ই যে তাতে সন্দেহ নাই। আমরা আমাদের জীবনের চিরাচরিত ধারা পাল্টাতে চাই।

এই কি আপনাদের চিরন্তণীর অর্থ? আজ যাঁরা নারী ব'লে সংসারে পরিচিত, কোন দিন এঁরা পুরুষ ছিলেন ব'লে শুনেছেন কি? মনের ইচ্ছায় এবং সেই ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেবার জন্য যতো বড় বড় নজীরই দেখাতে চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃতিগত অভিশাপ বা আশীর্ব্বাদ যাই আপনি মনে করেন তাকে এড়াবেন কি ক'রে? এটুকু দৌর্ব্বল্য নারীর স্বাভাবিক, একে পাল্টানো যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আর নারীর এই দুর্ব্বলতাটুকু পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য্যের পরিচয় বিশেষ।

সভাপতি মহাশয়ের কথায় এক পাশে একটা চাপা হাসি উঠল, কিন্তু কল্পনা মুখার্জ্জি তাতে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে ব'লতে লাগল: প্রকৃতির উপরই শুধু দোস চাপাচ্ছেন কেন? পুরুষ, আপনারা নানা প্রকারে ঐ কথাটাই শুধু প্রচার করেন যে নারী অবলা, আর ঐ পবিত্রতার মোহ দেখিয়ে ক'রে রাখতে চান তাদের দুর্ব্বলা! এই-ই তো আপনারা ক'রছেন এতোকাল ধ'রে।

সভাপতি মহাশয় ব'ললেন: হয়তো করেছি, স্মরণ নেই। আপনি এক এক ক'রে দেখিয়ে দিন আমিও উত্তর দিচ্ছি।

কল্পনা মুখার্জ্জি ব'লতে লাগল: ক'টা দেখাব? বাস্তব জীবনে সমস্ত কিছুতেই আমরা পুরুষের পেছনে। গার্হস্থ্য জীবনে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে আপনাদের যে অধিকার আছে নারীর তা' নেই।

সভাপতি মহাশয় হেসে উত্তর ক'রলেন: নারীর সে সুযোগ কোথায়? ···আর, তা নাই ব'লেই না সে পুরুষের ধর্ম্ম কার্য্যের অর্দ্ধেক ফল পেয়ে থাকে। কিন্তু কই? কোন দিনই শুনলামনা যে স্ত্রীর পুণ্য কার্য্যের অর্দ্ধেক ফল স্বামীর প্রাপ্য? অথচ পূজা আহ্নিক থেকে যে কোনওরূপ পূণ্য এবং গৌরব-জনক কার্য্যেই নর ও নারীর সমান অধিকার র'য়েছে ব'লেই শাস্ত্রে প্রমান পাওয়া যায়!

কল্পনা ব'লল : শাস্ত্র পুরুষের তৈরি, তাই নারীকে হ'তে হ'য়েছে তাদের মুখাপেক্ষী। মৃত্যুর পর পুণ্য ফল অর্দ্ধেকটা পাব কি পাবনা কে জানে? একটা ছেলে ভুলানো কথা দিয়ে নারীকে সে-দিন অমনি ক'রেই পুরুষ দাবিয়ে রেখেছিল।

নর কেন নারীকে দাবিয়ে রাখতে পারল? পুরুষ একাই বা কেন শাস্ত্র তৈরি ক'রল, নারী কেন ক'রলনা, আর নারী কেনই বা তাতে আপত্তি তুললো না? সে দিন যদি আপনাদের মত উচ্চ শিক্ষিতা দূরদর্শী মহিলার অভাব থাকত তবে আপনার ও-কথা বিশ্বাস ক'রতাম। নর যা ব'ললেন আর নারী তাই মেনে নিলেন, কেন?

সভাপতি মহাশয়ের সে-কথার উত্তর না দিয়ে কল্পনা নিজের খেয়ালেই ব'লে চলল : প্রত্যেকটী কাজেই পুরুষ এমনি অবিচার ক'রে আসছে নারীর উপর। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই জুলুম, জবরদস্তি। কি শিক্ষা, কি বাস্তব জীবনের চলাফেরা, সামাজিক আচার ব্যাবহার, মেলামেশা,—সমস্ত কিছুতেই দেখা যায় পুরুষের এই পক্ষপাতিত্ব!

সভাপতি মহাশয় ব'ললেন : আপনি এক সঙ্গে অনেকগুলি অভিযোগ ক'রে ব'সলেন এমন ক'রে যে আমি সব গুলিয়ে ফেললাম। আমায় একটা একটা ক'রে বুঝতে দিন দেখি। আপনাদের উপর অবিচার হ'য়েছে, না? আর, এটা ক'রেছে পুরুষ; এই তো আপনার বক্তব্য? বেশ! আমাদের দেশে পুরুষই শতকরা কতোজন শিক্ষিত আমায় ব'লতে পারেন?—এবং এ শিক্ষা আরম্ভ হ'য়েছে কবে থেকে? পুরুষ ও নারীর শিক্ষার এই যে পার্থক্য কেন, তার কারণ পরে আমি বলছি।

বাস্তব জীবনের চলাফেরা এবং মেলামেশার সুযোগও আপনাদের দেওয়া হয়নি আপনি ব'লেছেন। মেলামেশা ব'লতে আপনি যদি বলেন যে নারীদের মধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আপনাদের নাই তবে

অতি দুঃখের সঙ্গে ব'লতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের জীবনে নারীদের দু'টী শ্রেণী আছে। একটা বিশেষ শ্রেণীর নারীদের সঙ্গে সমাজের কোন মহিলার অবাধ মিশ্রণে সমাজ অনুমতি দেয় না সত্য; এবং কোনও মহিলার পক্ষে সেটা দাবী করাও বাঞ্ছনীয় নয় ব'লেই আমার মনে হয়। যদি বলেন যে আপনি সেই পতিতাদের কথা বলেননি, আপনাদের মহিলাদের কথাই ব'লছেন তবে তার উত্তর আমি দেবনা। কারণ, মহিলাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নাই একথা আজ আপনার মুখেই প্রথম শুনলাম। আর, মেলামেশা ব'লতে যদি আপনি পুরুষের সঙ্গে মিশবার কথা বলেন তবে আমি ব'লব যে সে অভিযোগ তো প্রত্যেক পুরুষও ক'রতে পারে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষ্য ক'রে দেখবেন যে অন্তরে অন্তরে অথবা গোপনে পুরুষ যতো উশৃংখলই হ'কনা, তারা কিন্তু এটা চায়না। আর চাইলেও তার অভাবে অভিযোগ করেনা। তবে, এতে পক্ষ পাতিত্বের কথা কি ক'রে আসে?

কল্পনা মুখার্জ্জি নীরব। সভাপতি মহাশয় ব'লতে লাগলেন: আপনি হয়তো ব'লবেন: আমরা ঘরে বন্দী থাকবো কেন? পুরুষেরও যেমন সংসার নারীরও তেমনি, তবে একা আমরাই কেন দিন রাত ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে হাত পুড়িয়ে মরব? সন্তান তো একা নারীর নয়, সে-ই কেন তাকে নিয়ে দিন রাত জ্বালাতন হবে?

কল্পনা মুখার্জ্জি ব'লল: হ্যাঁ···ঠিকইতো!

সভাপতি মহাশয় ব'ললেন: কিন্তু এর উত্তরগুলি বোধ হয় না দিলে চ'লবে। আশা করি এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রবার মত দুর্দ্দিন আজও বাংলায় আসেনি!

এমনি সময় একটী বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন: আমার কিন্তু মনে হয় সে-দুর্দ্দিন এসেছে। সভাপতি মশাই যদি কষ্ট ক'রে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন তবে বড়ই সুখী হব।

সভাপতি মহাশয় ব'ললেন : আমিও জানি···দিন হয়তো এসেছে কিন্তু এর উত্তর ও কারণগুলি এমনই সহজ-বোধ্য যে এ-বিষয়ে কিছু ব'লতে আমার মনে হয় যে আমার এই সব বাঙালী বোনদের অনেকখানি হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। কারণ, যে-ই একটু গভীর ভাবে চিন্তা ক'রবেন তিনিই বুঝতে পারবেন যে, সাংসারিক কর্ত্তব্যের ভাগবাটোয়ারা ঠিক এমনটা না হ'য়ে আর কিছু হ'তে পারে না বা পারত না সে দিন।

( তবে আজ যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাও আমি অস্বীকার করিনা ) যাঁকে গর্ভধারণ ক'রতে হবে, সন্তানের মুখ তাকিয়ে, নাড়ীর টানে তাকেই হ'তে হবে সংসারে বন্দী। যার অন্তরে কাম র'য়েছে, স্নেহ প্রেমও তার আছে,—আর সেই স্নেহ প্রেমই তাকে স্বামী, পুত্র, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরিজনের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য করাবে।

সভাপতি মহাশয় মৃদু হাসির সঙ্গে আবার ব'ললেন : তবে মন এবং স্বাস্থ্যের জন্য এঁদেরও যে মুক্ত হাওয়ার দরকার তা আমি অস্বীকার করিনা এবং সে-দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য পুরুষ ও নারী উভয়কেই আমি অনুরোধ করি। —মুক্তি এবং তার সরল আনন্দই শুধু, সহজ উশৃংখলতা নয় অবশ্য।

কল্পনা ব'লল : আপনি নিজেই তো একটু আগে স্বীকার ক'রলেন, যে সন্তান স্ত্রীরও যেমন স্বামীরও ঠিক তেমনি, তবে স্ত্রী একাই কেন তার সুখ সুবিধার জন্য ব্যাকুল হবে?

সভাপতি মহাশয় উত্তর ক'রলেন : না, কর্ত্তব্য উভয়েরই সমান। তবে পুরুষের কর্ত্তব্য বাইরে আর নারীর কর্ত্তব্য ঘরে এইটুকু পার্থক্য।

—আর নারী যদি বাইরের কাজ ক'রতে পারে?

ক্ষতি নাই, আপত্তিও কেউ ক'রবে না, যদি তাতে তার স্বাস্থ্যের এবং অন্তরের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের কোনরূপ হানি না হয়।

শ্রী হানি কেন হবে? বাইরের কাজে পুরুষের তো স্বাস্থ্য, শ্রী হানি হয় না।

সভাপতি উত্তর ক'রলেন : তার কারণ ঘরে এসে সে বিশ্রাম পায় কিন্তু নারীর সে সুযোগ কোথায়? এ অভিযোগের মীমাংসা সেই সৃষ্টি কর্ত্তার দরবারেই হ'তে পারে কারণ তিনিই নারীকে নর হ'তে পৃথক উপদানে সৃষ্টি ক'রেছেন। এ সভায় আমি বড জোর সেই কথাটাই ব'লতে পারি যে নর বাইরে থেকে যা কিছু সংগ্রহ ক'রে এনে দেবে নারী ক'রবে তাই দিয়ে সৃষ্টি-সাহায্য। শিশু সন্তানের বায়না মেটাতে মা যত সহজে এবং মুহূর্ত্তেই পারেন পিতার পক্ষে তা চিরকালই একরূপ অসম্ভব! এখানেই সেই সৃষ্টিগত পার্থক্য। অবশ্য এই সমস্ত সমস্যার মুখ বন্ধ করবার জন্য জন্ম নিরোধ ও গর্ভনিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও চ'লছে কিন্তু তার উপরে তো কেউ যেতে পারেন না! আর সে সব ব্যবস্থাও চলছে নারীর উপর দিয়ে; তা' হ'লেই বোঝা যাচ্ছে নারীর আর নর হওয়া কোন দিনই সম্ভব হ'লনা, অনেক চেষ্টা ও চিন্তায় কিছু কিছু সুবিধা হয়তো ক'রে নিতে পারেন তাদের জীবনে। সুতরাং লীলা দেবীর 'নারভাস' হওয়ায় আপনাদের অপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? ও 'লাইসেন্স' ওঁদের আছে বলেই তো আমার বিশ্বাস।

এ-কথায় সভামণ্ডপে একটা উচ্ছ্বসিত হাসির রোল উঠল।

সভাপতি মহাশয় আবার ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন : তবে নারীর পক্ষে এইটুকুই আমি ব'লতে পারি যে সত্য সত্যই আজ তারা অনেকখানি অসুবিধার মধ্যে এসে প'ড়েছেন। আমাদের সমাজের এখন উচিৎ···যদিও সমাজ যাকে বলে তা' আমাদের নাই, তবুও উচিৎ নূতন কিছু কিছু বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তন করা, নইলে পরে আমাদের অনুতাপ ক'রতে হবে।

শিক্ষিতা আধুনিকাদের দেখে যারা নাসিকা সঙ্কুচিত করেন তাদের আমি ব'লব স্বার্থপর, অনুদার, অদূরদর্শী অন্ধ এবং আত্ম-সর্ব্বস্ব।

যদি কেউ মনে করেন, পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্তু শাস্ত্রের

একটী অক্ষরও পারেনা পালটাতে, তবে আমি তার প্রতিবাদ করি। দেশ কাল শিক্ষা এবং রুচি ভেদে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হওয়া উচিৎ।

আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও শাস্ত্র আজকার এই বিপ্লবের আভাস দিয়ে যেতে পেরেছে সত্য কিন্তু তার বেশী কিছুই না। তাদের পরবর্ত্তী সভ্যতা সেই শাস্ত্রকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে ক'রে রইল নীরব, অতীতের মোহেই অন্ধ, পা'রলনা তারা সেই পুরাতন সভ্যতাকে ভিত্তি ক'রে আর একটী পদও অগ্রসর হ'তে। এখানেই এলো হিন্দু সভ্যতার দুর্দ্দশা, ফলে আরম্ভ হ'ল ভাঙন।

কয়েকশত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলায় ছিল মৃতের যুগ। না ছিল তাদের নিজেদের সমষ্টিগত দৃঢ় ধারণা, কোন মতবাদ। যখন যে-দেশ থেকে যে এসে যা বিধান দিয়েছে তখনই তারা তাই ক'রেছে গ্রহণ। সে যুগের দোহাই আমরা শুনবনা। নজীরই যদি দেখাতে হয় তবে আরও অনেক উপরে উঠতে হবে। সেই মৃতের যুগে, শাস্ত্রের অর্থও করা হ'য়েছে তেমনি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। সেই সব মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মনগড়া বিধানই আমাদের দেশে আজ শাস্ত্রের সম্মান পেয়ে ক'রছে শুধু অবিচার, পীড়ন। যার ফলে আজ চতুর্দ্দিকে অশান্তি, এই সব প্রশ্ন, এই সব ব্যতিক্রম ; নারীর এই মুক্তির বাসনা আর পুরুষের এই 'গেল গেল' চিৎকার।

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী এঁদের অসতী ব'ললে, অগ্নিশর্ম্মা হব, ঘুম থেকে উঠেই এদের নাম স্মরন ক'রব অথচ এদের সতী ব'লব কেন তা ও পারবনা প্রমান ক'রতে। সেই বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা নিয়ে বিচারক হওয়া সাজে না। কুসংস্কারের প্রথা আর চ'লবেনা, সে অন্ধ ও বোবা যুগ ম'রে গিয়েছে। আজ কম-বেশী সকলেই চোখে দেখে, কার্য্যের পেছনে কারণ খোঁজে, তাই ভুঁয়ো ফাঁকা আওয়াজে এই বিবাদের মীমাংসা সম্ভব নয়।

আজ সমাজকে হ'তে হবে উদার, বিবেচক এবং রক্ষক, কসাইয়ের প্রবৃত্তি নিয়ে আর সমাজপতির আসনে ব'সে থাকা চলবে না।

উচ্ছ্বসিত করতালিতে শেষের কথাগুলি কিছুই শোনা গেল না।

সে-ধ্বনি কতকটা প্রসমিত হ'তেই সভাপতি মহাশয় ব'ললেন : তবে আজকার মত আমি সভার কার্য্য শেষ ক'রলাম। কথা প্রসঙ্গে যদি কাকেও কোনরূপ আঘাত দিয়ে থাকি তবে তার জন্য আমি মার্জ্জনা চাচ্ছি।

ছোট্ট একটা নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি মহাশয় ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে আরম্ভ হ'ল হৈ হৈ গণ্ডগোল।

-হ্যাঁ, আসাও যেমন, যাওয়াও তেমনি,...সবই অদ্ভুৎ।

রমনের কথায় আশুবাবু ব'ললেন : আহা, নামটা কি ? দক্ষযজ্ঞ কেমন পড়িয়েছিল মনে নাই ?

এ যুগের নন্দী ভৃঙ্গি কিন্তু সে যুগের চেয়ে উন্নত ?—এ তোমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে।

কে একজন পাশ থেকে ব'লল : মশাই বোধ হয় সেই লোভে এ-যুগের পিনাকের বাহন হ'তেও রাজী আছেন ?

রমন উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু আশুবাবু তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ব'লতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দূরে ভীড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে ডালিম। আর কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে সকলে ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পেছনে তখন তাদের এক ঝলক কড়া হাসির শব্দ।

*  *  *  *

রেবা একটা যা কাণ্ড ক'রে ব'সল, সুধা তা কখনও কল্পনা ক'রতে পারে নি। ভীড় পেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই রেবা এসে নত হ'য়ে তার পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিল। রায় অবাক ! এ কি লীলা !

লীলার স্বপ্নই দেখছ বুঝি ? কিন্তু আমি রেবা।

ব'লেই সে পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রল। লীলা নীলিমা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সমস্ত মেয়েই সেখানে জড়ো হ'য়েছে। রেবা ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখল সকলে মিলে লীলাকে একরকম ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

হেনা ব'লল: বাবা! একেই ব'লে Sinking Sinking Drinking water. যাক্, মালাবদল যখন হ'য়েই গেল তখন আর ফুলশয্যার দেরী নাই। ভূরিভোজন পর্ব্বও সেই সঙ্গে হবে আশা করা যায়।

রেবাকে দেখে নীলিমা সুধার সম্বন্ধে কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল বাধা দিয়ে রেবা ব'লল: ভগবান যে আছেন এ হচ্ছে তারই প্রমাণ।

সকলে রেবার পানে ফিরে তাকাল স্মিত মুখে। সুধারায়ের এই অতর্কিত আবির্ভাব ঝড়ের মাঝে যেন সহসা শান্তির বাতাস বয়ে এনেছে।

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল: রেদি! তুমি কল্পনাকে চিনতে পারোনি?

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: না, কল্পনা আবার কে এলো?

সুধাবাবুর যার সঙ্গে বাকযুদ্ধ হ'ল ওরই নাম কল্পনা।......আমাদের সঙ্গে প'ড়েছিল যে কিছু দিন!

তাতো হ'ল, কিন্তু লীটা উঠে গেল কেন?

রেবার কথায় সকলে পাশে তাকিয়ে দেখল লীলা সেখানে নাই।

কোথায় গেল আবার দেখি। ব'লে ডলি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটীর পর একটী ক'রে সকলেই উঠে গেল; রইল শুধু রেবা ও নীলিমা।

এমনি সময় সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল বিজন ও সুলেখা সঙ্গে সুধারায়। রেবা ও নীলিমা উভয়েই উঠে দাঁড়াল।

ওকি উঠছেন কেন? বসুন, ব'লে বিজন ব'সল।

রেবার পানে চেয়ে সুধা ব'লল: তুমি যে দেখছি দিনে দিনে হেঁয়ালী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ, ব্যাপার কি?

মৃদু হাসির সঙ্গে রেবা ব'লল: আমারও ঠিক ঐ প্রশ্ন। এ কাজে হাত

দিয়ে অবধি আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি এদিকে পিনাক বাবু সেজে মজা দেখছো। আশ্চর্য্য !

বিজন ব'লল : আশ্চর্য্য তো আমিও কম হচ্ছিনা। এ কি ব্যাপার ?

ব'লে সে একবার রেবার পানে আর একবার সুধার পানে তাকাল।

সকলের চেয়ে মর্ম্মান্তিক অবস্থা সে সময় সুলেখার। এতদিন ধরে পিনাকের নামে সে যতখানি গৌরব বোধ ক'রেছে সে সমস্তই আজ এই মেয়েগুলি সুদ সমেত তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিল। কোন কথা না ব'লে সে তাই নীরব রইল।

সুধা রায়ই যে পিনাক রায় একথা সুলেখা জানতো না কিন্তু তারা তো জানতে পেরেছে, আর জেনেও তাকে কোন কথা না ব'লে সকলে নীরবেই এই জয়ের আনন্দ উপভোগ ক'রছে। এমন কি সুলেখার পরাজয়ের কথাটাও একবার তাকে ব'লল না, এ রহস্য সুলেখাকে আঘাত ক'রল।

তোমার ঐ পিনাক নাম কিন্তু আমাদের জন্য নয়। আমরা তোমাকে সুধারায় ব'লেই এতোদিন জানি।

রেবার কথায় সুধা ব'লল : নিশ্চয়ই, ঐ সুধারায়ই আমার প্রথম নাম। পিনাক নাম আমার নিজের সৃষ্টি। অবশ্য বিশেষ উদ্দেশ্যে,·········আর ও সম্বন্ধে কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রলেই সুখী হ'ব।

সৃষ্টির বাহাদুরি আছে স্বীকার করি। সত্য ব'লতে কি, ঐ পিনাক নামটার উপর আমাদের কারোরই তেমন শ্রদ্ধা ছিলনা···আকর্ষণও নয়।

তা' হ'লে আমাকে সভাপতি ক'রলে কেন ?

রায়ের প্রশ্নে রেবা বিব্রত হ'য়ে ব'লল : তোমার কথাতো হ'চ্ছেনা, কথা হ'চ্ছে শুধু তোমার ঐ নামের।

কল্পনার জল্পনা তো ঘুচিয়ে দিলে কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে তোমার নিষ্কৃতি নাই।

হেসে সুধা ব'লল: বেশ বল, যদিও নিষ্কৃতি আমি চাই না।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: আমাদের এই চিরন্তণীর সঙ্গে সত্যিই তোমার কোন যোগ আছে কিনা?

তোমার কি মনে হয়?

আমার মন দিয়ে কি হবে। নিজেই মনে ক'রে দেখো দেখি এই চিরন্তণীর মূল ভিত্তি কোথায় কিভাবে হ'য়েছিল?

সুধা উত্তর ক'রল: তা' যদি জানো তবে আর এই প্রশ্ন কেন?

তবে আর আমার কিছু ব'লবার নাই। ব'লেই রেবা হেসে ফেলল।

কিন্তু আমার কিছু ব'লবার আছে। মেয়েদের ঘোমটাটা আমি খুবই পছন্দ করি, সেটা তোমরা একটু রেখো। ব'লে সুধা হাসতে লাগল।

এ তোমার অন্যায় জুলুম, কল্পনা কাছে থাকলে তাকেই আমি শালিস মানতাম। ওঁরা বেড়াবেন মাথা উঁচু ক'রে বুক ফুলিয়ে আর আমাদের বেলায় ঘোমটা? ও চলবেনা আর।

রেবার কথা শেষ হ'তে নীলিমা প্রশ্ন ক'রল: নারীর এই ঘোমটা প্রথা কতোদিনের ব'লতে পারেন?

সুধারায় উত্তর ক'রল: খুব বেশী দিনের নয়। মুসলমান রাজত্বের আগে ভারতবর্ষে ঘোমটা বা পর্দ্দার প্রচলন ছিল না।

নীলিমা জিজ্ঞাসা ক'রল: মুসলমানদের পর্দ্দা প্রথা দেখেই কি আমদের এই পর্দ্দা প্রথার সৃষ্টি?

সুধা ব'লল: তা' হ'লে আক্ষেপ ছিলনা। অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের খুবই বেশী স্বীকার করি, বিশেষ ক'রে বাঙালীর, কিন্তু সেদিন ঐ পর্দ্দা বা ঘোমটার ব্যবস্থা ক'রতে আমরা বাধ্য হ'য়েছিলাম অন্য কারণে। নারীর অন্দর-রুদ্ধ হবার সেও একটা মস্ত বড় কারণ;—নইলে তার পূর্ব্বেও দেখা

যায় হিন্দুনারী শিক্ষিতা, এমন কি শাস্ত্রে ও মন্ত্রে সমান পারদর্শী কিন্তু মুসলমান প্রাধান্যের পর আর নারীশিক্ষা প্রচলনই রইল না।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : এর কারণ ?

কারণ, যে জন্য আমি ঘোমটা ভালবাসি।

তার অর্থ ?

তার অর্থ সেদিন ভারতের ধনসম্ভারই যে বিদেশীকে প্রলুব্ধ ক'রেছিল তা নয়। ধন রত্ন তো ছিলই আর তার মধ্যে কৌস্তুভ রত্ন ছিল ভারতের রমনী। তাই শক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল ব্যাভিচার, নির্বিচার ধর্ষণ। ধর্ষিত হ'য়েছে সেদিন পুরুষের পৌরুষ, তার সম্মান, মনুষ্যত্ব সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষিতা হ'য়েছে নারী।

মানুষের চিরন্তন স্বভাব—নিজের উপর অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারে সে, পারে না প্রিয়জনকে উৎপীড়িত দেখতে। বিশেষ, নারী ছিল সেদিন হিন্দু-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সৃষ্টির কারণ ও শক্তির অংশ। তাই পুরুষ চাইল তাকে লুকিয়ে রাখতে। ফলে, মুক্ত বিহঙ্গম প্রাচীরের মধ্যে হ'ল বন্দী। সৌন্দর্য্য ভরা মুখখানির উপর গুণ্ঠন এসে ক'রল অধিকার বিস্তার। হিন্দু-স্থানের পবিত্র হাওয়া ক্রমে হ'য়ে উঠতে লাগল মিশ্রিত, বিষাক্ত। তারপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে, অবগুণ্ঠনের পর্দ্দাও বেড়েছে। এমনি ক'রেই বাইরের জগৎ, সমস্ত শিক্ষা ক্রমে সরে গেল নারীর নিকট হ'তে অনেকটা দূরে। এদিকে পরাধীনতার চাপে পুরুষ হ'য়ে চ'লল নির্জীব, হীনশ্রী, মূর্খ, পরমুখাপেক্ষী, দাসভাবাপন্ন সঙ্গে সঙ্গে নারীও ভুললো তার এতোদিনের কর্ত্তব্য দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ। সে দেখল তার জীবনের অর্থ ··বাইরের আলোবাতাস· হীন অন্ধকূপে বাস, গৃহস্থালী আর সন্তান সন্ততি। সংসারের এই বীভৎস রূপ ক'রে তুললো তাকে রূপহীনা, গুণহীনা, আর সেই সুযোগে রাজশক্তির দৃষ্টান্তে পুরুষের অন্তরে এলো নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস এবং স্বেচ্ছ

আদর্শবাদ। তার ফলেই এলো দাম্পত্য জীবনের এই নিত্য অসন্তোষ এবং নিত্য নানা পাপাচার। তারপর থেকে এতোকাল এই তো চলে আসছিল, আজ পরিবর্তনের দিন এসেছে। তাই আমাদের সকলকেই হ'তে হবে আরও সাবধানী, কারণ একটা কূপ থেকে উঠতে গিয়ে আর একটা কূপে ঝাঁপিয়ে পড়লে···তার পরিণাম যে কী হবে তা' সকলেই বুঝতে পার। তবে ভুল ভ্রান্তি হবার আশঙ্কাই আজ খুব বেশী কিন্তু তাই ব'লে চুপ ক'রে থাকাও চলেনা। যেমন ভাবেই হ'ক এগিয়ে যেতে হবেই। আমার তো এই ধারণা রেবা, এখন তোমরা যা' ভাল মনে কর।

ব'লে নীলিমার পানে চেয়ে সুধা ব'লল: আপনি কি বলেন?

বিরক্ত হ'য়ে বিজন ব'লল: আর না, এখন এ ঝড় শেষ কর্। কি আশ্চর্য! ঝগড়া ক'রতে তুই এতো ভালবাসিস! ছুতোনাতা একটা পেলেই হ'ল।

নীলিমা ব'লল: আমি কিন্তু তর্ক করতে জানিনা, আমি ক'রব ঝগড়া-ই।

কারণ?

কারণ, আমি রেবার চেয়ে খুব বড় একটা কেউ কেটা বুঝি?

আমি তা' বলেছি কি?

তা' নইলে ঐ 'আপনি' 'নীলিমাদেবী' এসবেরই বা কি মানে হ'তে পারে?

ও:! হেসে সুধা ব'লল: যাক্, এখন থেকে শুধরে নেব।

বিজন রেবার পানে চেয়ে ব'লল: আপনারা আপনাদের সুধাবাবুকেই সভাপতি ব'লে পছন্দ ক'রেছিলেন তা আমায় ব'ললেন না কেন?

কেমন ক'রে বলি বলুন? দেখলাম পিনাকের নামে আমার ঐ সখিটী মূর্চ্ছা যান, তাই ব'লতে পারলাম না। ব'লে রেবা সুলেখাকে নির্দেশ ক'রল।

মূর্চ্ছা যেতে তোমরা কে যে পারোনা আমি তাই ভাবি। অভিনয়ে

নারীর কাছে পুরুষ চিরকালই শিশু,—ছাত্র। যাক্, তোমার কিন্তু বন্ধুপ্রীতি ও আত্মত্যাগ উভয়ই প্রসংশনীয়। ব'লে সুধা হাসতে লাগল।

রেবা যেন কি ব'লতে গিয়ে সহসা সুধার কথায় স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ক্ষণপরে ব'লল: যাক্ আমাদের মেসে তোমার নেমন্তন্ন হইল। যাবে কিন্তু, বিশেষ কথা আছে। আর, তখনই তোমার ঐ কথাটার উত্তর দেব। কে যে কত বড় অভিনেতা তা ব'লব কাল।

এরই মধ্যে তুমি চ'ললে নাকি? ব'লে সুলেখাও উঠে দাঁড়াল।

লীলা কোথায় গেল দেখি। ব'লে রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত্ত মাত্র, আবার সে ঘুরে এসে ব'লল: তুমি আছ তো?

দেখতেই পাচ্ছ! কেন, তোমার সন্দেহ হ'চ্ছে নাকি?

না, থেকো, পালিয়ো না যেন! একবার 'লেকে' একজন অভিনেতার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল, তার গল্পই ব'লব এসে, কিন্তু এরই মধ্যে না পালাও।

পালাব! তুমি বল কি! একদিন আমি মহামান্য ভারত সম্রাটের হাবিলদার ছিলাম।

সে কথা রেবার কাণে গেলনা, সে তখন সিঁড়ির উপরে।

এক এক ক'রে সুলেখা ও নীলিমাও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন বিজন জিজ্ঞাসা করল: পদ্মার পারের তারের কি হ'ল?

সুধা হঠাৎ কেন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল তাই বিজনের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'রল: এ্যাঁ, কি ব'ললে?

বিজন আবার জিজ্ঞাসা ক'রল: যে কাজের জন্য আজ তুমি আমার নাক কাটবার জোগাড় করেছিলে, সে কাজ কতদূর কি ক'রে এলে?

ওঃ! সুধা উত্তর ক'রল: বিশেষ কিছু ক'রতে পারিনি, মাত্র সূচনা ক'রে এলাম। বাড়ীটা মেরামত হচ্ছে। মেরামত শেষ হ'লে সেখানে মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী আর একটা দাতব্য হোমিওপাথি চিকিৎসালয় ক'রবার

বন্দোবস্ত ক'রে এলাম। আর, জমিগুলি পত্তনি দেবার কথা হ'য়েছিল কিন্তু ভেবে দেখলাম তা না দেওয়াই ভাল।

বিজন ব'লল: তবে সেগুলি রেখে কি ক'রবে, নিজে চাষ ক'রবে?

তাই তো ভেবেছি। যারা এ কাজে আমাকে সাহায্য ক'রছে তারা সকলেই ব'লছে যে তারাই চাষ আবাদ ক'রবে। আমিও দেখলাম যে তা' হ'লে ঐ স্কুল, লাইব্রেরী আর চিকিৎসালয় সবই আমি ফ্রি ক'রতে পারি। আর, ঐ জমির আয় থেকেই ওর খরচ চ'লতে পারে। স্কুলটা হচ্ছে বাবার নামে, লাইব্রেরী মায়ের নামে আর চিকিৎসালয়টা ক'রছি ত্রিবিক্রমবাবুর নামে।

ভুল শুনেছে মনে ক'রে বিজন আবার জিজ্ঞাসা ক'রল: কোন ত্রিবিক্রমের কথা ব'লছ?

মৃদু হাসির সঙ্গে সুধা উত্তর ক'রল: তুমি যাঁর কথা ভাবছ।

সুধার কথা শুনে বিজন যে শুধু বিস্মিতই হ'ল তা নয়, তার মনে হ'ল হয়তো সুধার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। নইলে এও কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে!

সুধার পানে চেয়ে বিজন ব'লল: রাত জেগে ট্রেনে এসে তোর মাথা ঠিক নেই। বেলাও অনেক হ'য়েছে, এবার নেয়ে খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নে। এসব কথা পরে হবে।

বিজনের কথা শুনে সুধা শুধু হাসল। বিজনের অপরাধ কি, একথা সে ব'লতেই পারে! শুধু বিজন কেন, যে কেউ তার জীবনের ইতিহাস শুনবে সে-ই তার সংকল্পের কথা শুনে তাকে পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে ক'রবেনা।

পাশাপাশি দুই পরগণার জমিদারের মধ্যে বহুদিন সদ্ভাব ছিল কিন্তু চির-দিন আর তা রইল না। ত্রিবিক্রমবাবুর অত্যাচারের সীমা ক্রমে তার নিজের

জমিদারী অতিক্রম ক'রে পাশের জমিদার হরদয়াল রায়ের জমিদারীও স্পর্শ ক'রল। আরম্ভ হ'ল দুই জমিদারের মধ্যে মামলা মকর্দ্দমা, নিত্য বিসম্বাদ। বহুকাল ব্যাপী মকর্দ্দমার পর কতগুলি জাল চিঠি এবং হাত-চিঠির সাহায্যে ত্রিবিক্রমবাবু জয়লাভ ক'রলেন। কিন্তু প্রজারা তবুও গুণগান ক'রে হরদয়াল রায়েরই। অথচ হরদয়াল রায়ের তখন দিন চলেনা, দেনায় মাথার প্রতিটী কেশ বিক্রীত। এতকাল যেখানে রাজার সম্মানে বাস ক'রেছেন আজ সেখানেই ভিখারী হ'য়ে বাস করা হরদয়াল রায়ের পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ব'লে মনে হ'তে লাগল। কিন্তু অন্যত্র চ'লে গেলে পাছে সকলে মনে ক'রে যে তিনি দেনা পরিশোধের ভয়েই পালাচ্ছেন, তাই কোথায়ো তাঁর যাওয়া সম্ভব হ'লনা।

সুধা চিরদিনই ডাং পিটে ছেলে। পিতার যে আশঙ্কা তার তা' নাই, তাই সে একদিন গোপনে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে প'ড়ল। শিয়ালদা স্টেশনে আসতে···বিনা টিকেটে আসার অপরাধে তাকে পুলিসে দেবেন ব'লে টিকিট কালেক্টার ভদ্রলোকটী সুধাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে তার স্ত্রীর হাতে সমর্পন করেন। পরে তিনি তা'কে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন।

কৌতুহলের বশে সুধা একদিন এক গির্জ্জায় যায় এবং সেখানে 'ফাদার ওথে'র সঙ্গে হ'ল তার পরিচয়।

'ফাদার ওথ' প্রথম দৃষ্টিতেই হয়তো সুধাকে চিনতে পেরেছিলেন তাই তার সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। দিন চ'লতে লাগল দ্রুতবেগে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুধার মনে যেন অশান্তি আরও প্রবল হ'য়ে দেখা দিল। সে শুধু ভাবে তার অতীতের কথা, পিতামাতার কথা, ছোট্ট তার বোনের কথা। ভাবে, আর কখনও কি তাদের দে'খতে পাবেনা সে!

* * * * *

## ইঙ্গিৎ

…জ্ব'লে উঠল ইওরোপের মহাসমর। কাতারে কাতারে সৈন্য ছুটল রাজার দোহাই দিয়ে পেটের জন্য প্রাণ দিতে। সুধাও তা'দের সঙ্গী হ'ল।

জীবনে মরণে যেখানে আলিঙ্গন, সেখানে 'টেন্‌টে' শুয়ে সুধা স্বপ্নে দেখে তার বাবাকে, মাকে, জীবনে কখনও-না-দেখা সেই ছোট্ট তার বোনটীকে। অতর্কিত কামানের ধ্বনি সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দেয় চুরমার ক'রে। বন্দুক ঘাড়ে সকলের সঙ্গে ছোটে সে প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে। অথচ তখনও তার বুকের তলে জীবনের অতি প্রত্যুষে ফেলে-আসা কুয়াশা মাখানো উষার স্নিগ্ধ হাসিটী। ফলে, সুধার 'রেকর্ড' হ'য়ে রইল খারাপ।

এমনি সময় কামানের গোলাকেও তুচ্ছ ক'রে পৌঁছল গিয়ে এক নিদারুণ সংবাদ। 'ফাদার ওথ' লিখলেন, 'তোমার বোন আমার কাছেই আছে, মৃত পিতামাতার আত্মার সদগতির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর'।

চমৎকার! সুধার মনে হ'ল, আঁধারের মাঝে যেটুকু ছিল বিজলির রেখা, তাও গেল মিলিয়ে। সৈনিক-জীবনের সুখস্মৃতি! যাক্, অবসরের জন্য আর অধীর হ'তে হবেনা! সুধার অন্তরের সুপ্ত পশু এবার যেন গর্জ্জে জেগে উঠল। যে ভাঙনের মুখে দাঁড়াবার কল্পনাও কেউ ক'রতে পারেনা সেখানে সুধা ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিশ্বাসে তার মৃত্যু যেন দূরে পালায় আর সে এগিয়ে চলে মহা উৎসাহে, মরনোল্লাসে।…সুধা হাবিলদার হ'ল।

কিন্তু তাকে শান্ত হ'তে হ'ল, শান্তির বাতাস বইল,…সত্য সত্যই শেষে সন্ধি হ'ল।

ফিরবার সময়, জাহাজে সকলে তাদের স্ত্রীপুত্র পরিজনের সম্বন্ধে আলোচনা করে আর সুধা ভাবে ; 'আমি দেশে ফিরছি কেন ? আমার তো ফিরবার কথা নয়'।…কিন্তু তাকে ফিরতে হ'ল। বৃদ্ধ 'ফাদার ওথ' যখন তার দুই শুখ বাহুর মাঝে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বালকের মত উচ্ছ্বাসিত আবেগে কেঁদে

উঠলেন তখন সন্থ যুদ্ধ-প্রত্যাগত হাবিলদারের চোখও শুষ্ক ছিলনা। চোখের জলে সুধা প্রতিজ্ঞা ক'রল যে সে এর প্রতিশোধ নেবে।

'ফাদার ওথ' যখন তাকে তার বোনের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিতে চাইলেন তখন সুধা সম্মত হ'লনা। সংসারে তার কেউ নাই একথাই সে জানতে চায়। আর যতোদিন সে তার এই প্রতিজ্ঞা পালন ক'রতে না পারবে ততদিন সে তার বোনের সঙ্গে পরিচয় ক'রবেনা। সুধা যে যুদ্ধ হ'তে বেঁচে ফিরে এসেছে এ সংবাদ যেন তার কাছে গোপনই থাকে।

বাধ্য হ'য়েই 'ফাদার ওথ' নীরব রইলেন।

*        *        *        *

*        *        *

বিজনের চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে সুধা ব'লল: আমি প্রতিশোধ নেব প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম—

তার কথার মাঝেই বিজন ব'লে উঠল: এমনি ক'রেই বুঝি সেই প্রতিজ্ঞা রাখছ?

তা ভিন্ন আর কি করতে পারি···তুমিই বল? আমার ব'লতে কি এমন আছে, যা নিয়ে আমি ত্রিবিক্রমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি? দেশের ঐ বাড়ী, ক'বিঘা জমি আর ক'লকাতার বাড়ীখানি মাত্র; এই তো সুধারায়ের সম্পত্তি!

বিজন ব'লল: বেশ! তোমার টাকার দরকার হয়; আমি দেব কিন্তু ত্রিবিক্রমকে অমনি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না।

হেসে সুধা ব'লল: তুমি একটু ভাবলেই বুঝতে পা'রবে···তাকে আমি অমনিই ছাড়িনি। যে শাস্তি তাকে আমি দিচ্ছি তা' সাধারন লোকে কল্পনাও ক'রতে পারে না।

ওঃ! ভারী শাস্তি! বিজন ব'লল: ত্রিবিক্রম এতে খুশীই হ'বে, বড়

গলায় সকলকে ব'লবে, বাপের ভুল বুঝতে পেরে ছেলে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রছে।

কিন্তু সংসারের সকলেই কি ত্রিবিক্রম? তারা কি জানেনা ত্রিবিক্রমবাবুর সঙ্গে আমার কি মধুর সম্বন্ধ? যতোদিন আমি ঐ 'ডিস্‌পেন্‌সারী'টা বাঁচিয়ে রাখতে পারব, ততদিন যতো রোগী আসবে সেখানে, সকলেই ব'লবে ত্রিবিক্রমের অত্যাচারের কথা; আর সঙ্গে সঙ্গে এই তোমারই মত সকলে এই ভেবে অবাক হবে যে যার জন্য আমার আজ এই দুরবস্থা তার নামেই আমি এই দাতব্য ঔষধালয় ক'রলাম কেন।

বিজন বিরক্তির সুরে ব'লল: তোমার সব কাজই অমনি। খামখেয়ালী ক'রে বোনটার সঙ্গেও পরিচয় ক'রলেনা। এদিকে 'ফাদার ওথ'ও মারা গেলেন, এখন সে বেচারীরই বা কি হচ্ছে না হচ্ছে কে জানে!

সুধা কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল এমনি সময় সে-ঘরে এসে প্রবেশ ক'রল রেবা ও সুলেখা। সুলেখা ঘরে ঢুকেই ব'লল: কি আশ্চর্য্য দেখেছ……

সুধা ব'লল: না, দেখিনিতো……

লীটা পালিয়েছে।

তার মানে? পুলিশে সংবাদ দিতে হবে নাকি? একা,…না…… ?

সুধার কথায় সুলেখা অধৈর্য্য হ'য়ে ব'লল: হাসি ঠাট্টার কথা নয়। মেসেই গেল না কি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

রেবা ব'লল: যাক, আমি মেসেই যাচ্ছি। যা হ'ক তোকে সংবাদ দেব। ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ল।

সুলেখা ব'লল: চল্, আমিও যাব তোর সঙ্গে।

তারা বাইরে যেতেই বিজন ব'লল: সত্যিই লীনা বড্ড 'নার্‌ভাস্'।

সুধা তার মুখের পানে চেয়ে একটু হাসল মাত্র।

রেবা ও সুলেখা মেসে এসে দেখে লীলা শুয়ে আছে।

সুলেখা লীলার চুলের গোছা ধ'রে নাড়া দিয়ে ব'লল : কিগো অভিমানিনী ! কাউকে কিছু না ব'লে ক'য়ে এমন ক'রে পালিয়ে এলে কেন ? পালালেই কি পালানো চলে !

পাঁশের ঘর থেকে হেনা গেয়ে উঠল :

ওরে এতেক সহিল রমণী বলিয়া,
পাষান হইলে ফাটিয়া যেতো !

রেবা ব'লল : তার চেয়ে বল্ না "আমার হইলে ফাটিয়া যেতো।"

কে ? রে'দি ! তুমি এ কথা ব'লবে বৈ কি ! তুমিই যে 'ম্যাচ্-মেকার' তা' আমরা বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু এখন শেষ রক্ষা কর।

ব'লতে ব'লতে হেনা এসে সে-ঘরে উপস্থিত হ'ল, সঙ্গে নীলিমা।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : ব্যাপার কি ?

লীলার পানে চেয়ে নীলিমা ব'লল : ও ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। আমরা চল পাশের ঘরেই যাই।

পাশের ঘরে এসে নীলিমা ব'লল : লীকে ওখানে না দেখেই আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়। মেসে এসে দেখি ও শুয়ে আছে কিন্তু 'সেন্স্‌লেস্'।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : এখন কেমন আছে ?

নীলিমা ব'লল : ভালই, কিন্তু যেমন ক'রেই হ'ক সুধাবাবুর সঙ্গে ওর বে দিতেই হবে।

নীলিমার কথায় রেবা সুলেখার পানে তাকাল। নীলিমা ব'লল : আমার মনে হয় : সু' ইচ্ছা ক'রলেই এ কাজ হ'তে পারে।

রেবা ব'লল : সুলেখা যে চেষ্টা ক'রবে এ আমি বিশ্বাস করি তবে ···

তবে আবার কি ?

আমি ভয় করছি সুধা বাবুকে! হয়তো তিনি ব'লে বসবেন; সে কি! বে ক'রব, এমন কথা তো ভাবিনি কখনও!

নীলিমা ব'লল: ব'ললেই হ'ল আর কি! তবে মু' রয়েছে কেন!

আরও কিছু সময় কথাবার্তার পর সুলেখা বিদায় নিল। তখনও লীলা ঠিক তেমনি ভাবেই শু'য়ে রয়েছে দেখে সুলেখা ব'লল: মানিনী! আমি যখন ঘটকালির ভার নিয়ে'ছি তখন তোমাকে আর অমনি ক'রে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে হবেনা।

সুলেখা কাজটাকে যতো সোজা ভেবেছিল বিজন কিন্তু ততটা সহজ মনে ক'রতে পারল না।

সুলেখা ব'লল: বে'ব আর বাকী কি বল? হাজার লোকের সামনে গলায় মালা দিয়েছে······

বিজন ব'লল:—সে তো একজনই, সুধা তো আর সে মালা তার গলায় ফিরিয়ে দেয়নি!

সেইটুকুনই তো শুধু বাকী, আর সেই জন্যই তো তোমাকে উকিল ধ'রেছি।

কিন্তু আমি কি পারব?

বিজনের এই বিনয়ে সুলেখা ঝংকার দিয়ে উঠল: না, তা' পারবে কেন! তোমরা পুরুষগুলি পারো শুধু মেয়েগুলিকে ভুলিয়ে তাদের মাথা খেতে, কিন্তু একটা কাজ দিলেই তখন পড একেবারে শুকিয়ে।

নেহাৎ গোবেচারীর মত বিজন ব'লল: হ্যাঁ, সুধাটাকে ব'লতে পারো বটে সে কথা, কিন্তু আমার অতি বড় শত্রুও পারবেনা আমাকে ঐ অপবাদটা দিতে।

ওঃ! কী আমার সাধু গো! ও গুমোর ক'র আর কোথায়ো। আমি বুঝি আর জানিনা তোমার দৌড়!

—আর তুমিও কি মনে কর তোমাকে কেউ বোঝেনি এতদিনে?

বিজনের কথায় সহসা সুলেখার ভাবান্তর হ'ল কিন্তু বিজন তা বুঝতে পারলনা। সহজভাবেই সে ব'লল: বেশ! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রলাম।

পরদিন রাত্রি তখন গভীর। অলস মন্থর পদে চ'লতে চ'লতে সুধা যখন এসে বিজনের দরজায় উপস্থিত হ'ল তখন প্রথমেই তাকে অভ্যর্থনা ক'রল বিজন।

বিজন জিজ্ঞাসা ক'রল: আচ্ছা! দিনে দিনে তোর বয়স বাড়ছে না কমছে?

—একদিকে যেমন বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একদিকে কমছেও।

বিজন তেমনি স্বরেই ব'লল: রাত ক'টা বাজে খেয়াল করিস্? তোর না হ'ক বুনো হাড, ক্ষিদে তেষ্টা নাই কিন্তু তোর জন্য যে কতগুলি মেয়ে হা ক'রে ব'সে আছে…

কেন? আমাকেই কি তাঁরা এ-রাত্রের ভক্ষ্য ব'লে মনে করেছেন? কিন্তু তুই-ই তো ব'ললি আমার বুনো হাড। এ কি তাঁরা হজম করতে পারবেন?

—তা' তুমিই ব'লতে পার। তোমার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলার জন্য যাদের 'চ্যালেঞ্জ' ক'রেছিলে, তাদের তুমি আমার চেয়ে বেশী চেনো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

হাসির সঙ্গে সুধা ব'লল: ভুল, ভুল বন্ধু। ওঁদের 'দেবা ন জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যা'—

উপরে উঠতেই সামনে এসে দাঁড়াল রেবা।...সুধার মনে হ'ল যেন সে কিছু ব'লতে চায়, তাই সে রেবার মুখের পানে তাকিয়ে ব'লল : কি ?

কি আর। তুমি প্রস্তুত ?

অপ্রস্তুত আমাকে কোনদিন দেখেছ কি ?—কিন্তু ব্যাপার কি ?

থাক্, ঐ পর্য্যন্তই যথেষ্ট, আর ব্যাপার দিয়ে দরকার কি ? ব'লে রেবা সুধার হাত ধ'রে টানতে টানতে যে-ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল ক্ষুদ্র সে ঘরখানি তখন প্রায় অর্দ্ধশত সুন্দরীকে বুকে ধ'রে শোভা পাচ্ছে যেন কোন্ কল্পনার উদ্যান। সুধাকে নিয়ে রেবা ঘরে ঢুকতেই সুলেখা এসে সুধার আর একখানি হাত ধ'রল।

সুধা চিৎকার ক'রে উঠল : এ কী বিজন ! শীগ্‌গীর লালবাজারে 'ফোন' করে দে।

তার কথায় ঘরের মধ্যে একটা হাসির ধূম পড়ে গেল।

মুখে সুধা যতো রসিকতা করুক না, অন্তরে অন্তরে সে অনুভব ক'রতে লাগল একটা অসাচ্ছন্দ্য। সমস্ত ঘটনার পরিণাম চিন্তা করে মুহূর্ত্তেই তার অন্তরের যে অবস্থা হ'ল মেয়েদের মধ্যে এমন কেউই নাই যে তা কল্পনা ক'রতে পারে। লীলা ? সে কি জানে !

বিশ্বের কেউ না জানুক কিন্তু সে তো জানে যে লীলা ত্রিবিক্রমবাবুর মেয়ে। সে তো জানে এই বিবাহের পরিণাম কি !

সেদিন 'লেকে'র সেই কথা স্মরণ ক'রে সুধার অন্তর অনুশোচনায় ভ'রে উঠল কিন্তু হায় নেহাৎই অসময়ে।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অপরাধ স্বীকার অথবা তার অনুশোচনায় অপরাধের মার্জ্জনা হয় না, উচ্চারিত দণ্ডও হ্রাস হয় না।

নীলিমাকে ইঙ্গিত ক'রে সুলেখা ব'লল : নিয়ে আয়।

সুধা জিজ্ঞাসা ক'রল : আনবে কি ? ছুরি, কাটারি ? এসব যে দেখছি জবাই করবার আয়োজন।

রেবা ব'লল : জবাই তো মাত্র আড়াই প্যাচ। আর সে হ'ল মুসলমানের কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের ভাষায় এর নাম বলি। কেটেই এ শেষ করেনা, কেটে, জিইয়ে নিয়ে আবার কাটে।

এমনি সময় নীলিমা এবং স্বলেখার সঙ্গে সে-ঘরে প্রবেশ ক'রল এক অবগুণ্ঠিতা এবং তার পেছনেই শুভ্র উপবীত ধারী এক ব্রাহ্মণ।

বিজনও শেষটায় বিশ্বাসঘাতকতা করলি !

সুধার কথায় বিজন ব'লল : কি রকম ! আমি আবার কি করলাম ? নিজেই তো সব ক'রেছ, এখন ন্যকা সেজে বিজনের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ কেন বন্ধু ?

মুখটা বন্ধ ক'রে এবার একটু ভদ্রলোক হ'য়ে ব'স দেখি। ব'লে রেবা সুধার কঠিন মুষ্টি মধ্যে লীলার একখানি হাত পুরে দিল।

ডলি চিৎকার ক'রে উঠল : ও কোন্ হাত দিচ্ছ ! ডান হাত দিতে হয় বোধ হয়।

সবই এখানে বোধ হয়'র দল, ঠিক ক'রে কেউ কিছু যদি ব'লতে পারে ! ব'লে রেবা স্বলেখাকে ধাক্কা দিয়ে ব'লল : তোরই তো এসব করা উচিৎ। ধাড়ী মেয়ে, বে-ই করেছ···জানোনা কিচ্ছুটি ! ঠাকুর মশাই ! বলুন না কি ক'রতে হয় ?

ঠাকুর মশায় বিংশ শতাব্দীর পুরোহিত। 'যস্মিন দেশে যদাচার' কথাটার সার্থকতা ক'রতে তিনি ভুল ক'রলেন না। ব'ললেন : যা করেন আপনারা তাতেই হবে। মন নিয়ে হ'ল কথা, তার বড় কিছুই নাই। বে' তো আপনাদের হ'য়েই গিয়েছে।

ঠাকুরের কথায় মেয়েরা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সুধা ব'লল : এখানে যতো মেয়ে আছে সকলকেই জড়াচ্ছেন নাকি ঠাকুর মশাই ? তাতে পাওনাটা বিশেষ ভাল হবে ব'লে মনে ক'রবেন না।

সকলে হো হো শব্দে হেসে উঠল।

রেবা বর-কণের হাতে লাল সুতা জড়াতে জড়াতে ব'লল : ওরে হুলু দেরে, হুলু দে।

কিন্তু হুলু কে দেবে ? 'ন্যাস্‌টি' হুলু ছেড়ে যাঁরা এতোদিন ধ'রে সঙ্গীতই ক'রছেন শুধু, আজ হঠাৎ প্রেম-পরিণয়ের দোহাই দিয়ে হুলুধ্বনি করা কি তাদের পক্ষে এতোই সোজা !

কেউই যখন হুলুধ্বনি ক'রলনা তখন রেবা ব'লল : হাতে দিলাম মাকু, ভ্যা করতো বাপু।

প্রায় অর্দ্ধশত মেয়ের হাতে পড়ে সুধার তখন 'ভ্যা' ডাকবার মতই অবস্থা।

এটা মেয়েদেরই রাত ! যার যা খুশী সে তাই ব'লছে, তাই ক'রছে !

কয়েকটী মেয়ে এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে মুচকি মুচকি হাসছিল। রেবা তাদের টেনে নিয়ে এলো মাঝখানে।

ও-কি ! বাসর ঘরে কি কেউ আবার অমনি ক'রে থাকে নাকি ! নে' গান কর সব। ব'লে সে হারমোনিয়মটা এগিয়ে দিয়ে ব'লল : তোদের সামনে এখনও আশা আছে, পথ আছে, যতো পারিস স্ফূর্ত্তি ক'রে নিবি তা' না, দেখনা বসে আছে সব যেন……

ব'লতে ব'লতে সহসা সে নীরব হ'য়ে গেল। মনে হ'ল তার এক বন্ধুর কথা। বিবাহের পর একটী বৎসরের মধ্যেই বিবাহের সমস্ত সুখ-স্মৃতি যার জীবন হ'তে মুছে গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। তার বাসর ঘরেও রেবা

সেদিন কি না ক'রেছিল! রেবার মনে হ'ল, বাসর ঘর যেন সেই সব যুবতী বিধবাদের কাছে শ্মশানের চেয়েও নির্ম্মম!

মুহুর্ত্তের জন্য রেবার মন বিষন্ন হ'লেও হাস্যে লাস্যে রঙ্গে কৌতুকে এই অপূর্ব্ব মেয়েটী সে-রাত্রের বাসর ঘরখানিকে মুখর ক'রে রাখল। কিন্তু ভোরের শেষে যদি কেউ তার সন্ধান ক'রত তবে সে দেখে বিস্মিত হ'ত যে ঐ হাসি আনন্দের অন্তরালে আরও কতো কিই না সে গোপন ক'রে রেখেছিল। লীলার হাসিমুখ তাকে যতো তৃপ্তিই দিক না, অন্তরের অভাব যেন তাতে পূর্ণ হ'তে চায়না।

সত্য সত্যই শেষে দুর্ম্মুখের মুখরতার ফল ফ'লতে আরম্ভ ক'রল।

মেয়েদের 'চিরন্তনী' সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে পরে দুর্ম্মুখ লিখেছে।

"সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল
হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তার পুলকিত তনু জর জর
মন আপনারে ভুলিছে!
তার পিতা মানে পরমাদ······"

এই নামহীন পরিচয়হীন পিনাক-লীলা সুদূরবাসী কন্যার পিতার প্রাণে না জানি কী রসেরই সঞ্চার ক'রবে।—তেমন যদি কিছু হয় তখন আবার আমাদের সখেদে ব'লতে হবে 'আহা'!

যা হ'ক অভ্যাগত সকলেই যে মিষ্টি হাতের মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত হ'য়ে ফিরেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যদি গোপনে নিভৃতে একবার চিন্তা করি যে এই 'চিরন্তণী'র পশ্চাতে এই সব 'আলোক-

লোকাদের' একটী সূক্ষ্ম জাল বহু পূর্ব্ব হ'তেই সজ্জিত ছিল ; তা' হ'লে কি আমরা অপরাধীপর্য্যায়ে পড়ি ? আমরা হয়তো বা প'ড়লেও প'ড়তে পারি কিন্তু এতো সূক্ষ আলো কতোদিন আর প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকতে পারবে ! ……

দুর্ম্মুখের এই প্রচারের ফলে প্রায় সকল মেয়েরই ক্লাসের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল। শুধু তাই নয় একটী পর একটী ক'রে প্রায় অধিকাংশই মেয়েকেই রাজধানীর এই আলো হাসি ভরা রাস্তা, মাঠ, সিনেমা ও উদ্যানকে অন্তিম নমস্কার জানিয়ে আভভাবকের সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে হ'ল। কী সে করুণ দৃশ্য ! এ যেন বালিকা বধুদের পতিগৃহে যাত্রা, যুবতীদের পিতৃগৃহে যাবার পূর্ব্ব রাত্রি আর বৃদ্ধদের বিজয়াদশমী ! ……

রক্তের যোগাযোগ নাই, আত্মীয়তার বন্ধন নাই, বাল্যে এমন কি কৈশোরেও যাদের মধ্যে পরিচয়ের কোন সূত্র ছিলনা ; কটি মাত্র বৎসরের সহবাসে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্বই সম্ভব হ'ল তাদের, যার ফলে বিদায়ের কালে রেবার মনে হ'ল যেন একটা একটা ক'রে তার হাত পা সব দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। এদের বিরহে এতো ব্যথা। সকলের সঙ্গেই যে সকলের খুব সদ্ভাব ছিল তা' নয় কিন্তু আজ যেন সবাই সমান, সবাই আপন, সবাই প্রিয়তম। এই হেনা, সব সময়েই তো তাকে সকলের ভাল লাগেনি, কিন্তু আজ ?……

এক এক ক'রে সকলেই চ'লে গেল, অবশিষ্ট রইল শুধু রেবা, লীলা, নীলিমা ও ডলি। সুধা পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি। বিবাহের পর সে যে কোথায় চ'লে গিয়েছে তা কেউ জানে না। সুধা যেখানেই যাক, রেবা এটা স্থির জানত যে লীলার সঙ্গে তাদের পৃথক হ'তে হবেনা কখনও। তাই তারা যখন একটা ছোট বাড়ী দেখে সেখানে উঠে যাবার আয়োজন

ক'রছিল তখন হটাৎ একদিন লীলার পিতার পীড়ার সংবাদ নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল' তাদের এক বৃদ্ধ সরকার।

ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক লীলাকে যেতেই হ'ল।

এক এক ক'রে সকলেই তো গিয়েছে। সে কষ্ট যতো বেশীই হ'ক— এতো মর্মান্তিক ব'লে তো কারো মনে হয়নি। কোন্ দস্যু যেন অলক্ষে থেকে দেহের প্রতিটী অঙ্গ খণ্ড ছিন্ন ক'রে নিয়ে এবার যেন সকলের প্রাণ নিয়ে আকর্ষণ ক'রছে।

বিদায়ের সময় রেবা লীলা নীলিমা এবং ডলি কারও চোখই শুষ্ক রইল না।

চোখের জল মুছে রেবা ব'লল: কাঁদিসনা ভাই! বাবা সুস্থ হবেন, ভয় কি! আর, যত শীগগীর পারিস, চ'লে আসিস।

একটা কথা লীলা বলি বলি করেও ব'লতে পারল না।

রেবা ব'লল: সুধাদা এলে আমি সব ব'লব, তোকে ভাবতে হবেনা। লীলার বিবাহের সংবাদ যথাসময়ে ত্রিবিক্রম বাবুকে জানান হ'য়েছিল, এখন এই ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব এবং দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে রেবা লীলার বাবার নিকট আর একখানি পত্র লিখল। "আপনার মেয়ে জামাইকে আপনি হৃষ্ট মনেই আশীর্বাদ ক'রবেন এই আমার প্রার্থনা।— আর, আশীর্বাদের পরিবর্ত্তে যদি আর কিছু আপনার মনে জাগে, তবে সে অভিশাপ···আপনার এই অপরিচিতা মেয়ের উদ্দেশেই দেবেন,—কারণ এই বিবাহের জন্য দায়ী যদি কেউ থাকে, তবে সে আমিই।"

রেবা ব'লেছিল লীলা যেন বাড়ী পৌছেই চিঠিখানা ত্রিবিক্রমবাবুকে দেয়, কিন্তু পথে বৃদ্ধ সরকারের নিকট লীলা যে সমস্ত কথা শুনল তাতে পিতার প্রতি একটা নিদারুণ অভিমানে রেবার চিঠির কথা সে ভুলেই গেল।

লীলা জানে তার পিতা অতি অদ্ভুৎ প্রকৃতির লোক। জীবনে কেউ কোনও দিন তাঁর বন্ধু ব'লে দেখেনি কাউকে। শুধু মামলা মকর্দ্দমা আর

হিসাবের খাতাই তাঁর চির সঙ্গী, এই সকলে জানে কিন্তু ঐ দুর্ব্বোধ্য লোকটীর অন্তরের পরিচয় লীলা যেমন জেনেছিল তেমন জানবার সুযোগ তো আর কেউ কখন পায়নি !

লীলার যখন মাত্র আড়াই বৎসর বয়স তখন সে তার মাকে হারায় কিন্তু ত্রিবিক্রমবাবুর স্নেহ কোনও দিনই তাকে সে অভাব অনুভব ক'রতে দেয়নি। লীলা কোনও দিন তার মার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেনি কিন্তু তার দাদা কিশলয় মাঝে মাঝে যখন লুকিয়ে চোখের জল ফেলতো তখন ঐ ক্রূর, কূট উগ্র প্রকৃতির লোকটী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বালক কিশলয়ের মতই যে কেঁদেছেন। নানারূপ কাজের ঝঞ্ঝাটে কোনও দিন ত্রিবিক্রম বাবুর খাবার অবসর হয়নি কিন্তু একটী দিনও তার মায়ের ফটোখানি ফুল দিয়ে সাজাতে তাঁর ভুল হ'য়েছে ব'লে লীলা মনে ক'রতে পারেনা।

যতোদিন তাঁর মা বেঁচে ছিল ততদিন ত্রিবিক্রমবাবুর প্রকৃতি এমন ভীষণ ছিলনা কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর হ'তেই ধীরে ধীরে তার চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটতে আরম্ভ করে। কত লোকের কতো সর্ব্বনাশ করেছেন ব'লে লোকে তার কুৎসা ক'রেছে। লীলা শুনে মনে মনে অনুভব ক'রেছে পিতার জন্য একটা সহানুভূতি, খানিকটা ব্যথা কিন্তু আজ সরকার কাকার মুখে পিতার বিবাহের কথা শুনে পিতার প্রতি তার অন্তরে জাগল যে ভাব তাকে লীলা অতি সহজেই গ্রহণ ক'রতে পারল না। এতোকাল পরে আজ লীলা মাতৃশোক নূতন ক'রে অনুভব ক'রল এতোদিনের ভুলে থাকার সমস্ত ব্যথা ও অপরাধ নিয়ে।

পিতার প্রতি অভিমান বশতঃই লীলা ত্রিবিক্রমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলনা। অবশ্য লীলা যখন গিয়ে পৌছল তখন ত্রিবিক্রমবাবু কাছারী বাড়ীতে। সরকার মশাই ব'লল: তুমি ভিতরে যাও মা, আমি বাবুকে সংবাদ দিচ্ছি।

বহুকাল পরে বাড়ী এসে লীলার চোখে আজ সবই নূতন ব'লে মনে হ'তে লা'গল। দু বৎসর পূর্ব্বে যখন কিশলয় বিলাত যায় তখন মাত্র এক সপ্তাহের জন্য সে বাড়ী এসেছিল, তার পর এই। এই দুটী বৎসরে কতো পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

লীলা সরকারের কথা অবিশ্বাস ক'রতে পারেনি তবুও এক এক বার তার মনে হচ্ছিল, না, একি হ'তে পারে! এতোকাল পরে, যখন কিশলয়ের বিবাহের সময় উপস্থিত তখন কি তার বাবা বিবাহ ক'রতে পারেন! বিবাহ যদি তিনি করবেনই তবে এতোদিনে কি ক'রতে পারতেন না! কিন্তু এই মিথ্যা সংবাদ দেবারই বা অর্থ কি! সত্য কথা ব'ললে সে কি আসতো না! এ ছলনা কেন তার সঙ্গে!

এমনি সংশয়াকুল চিত্তে লীলা বাড়ী এলো। বাড়ীতে পা দিয়েই সে বুঝতে পারল যে সরকার-কাকা তার সঙ্গে রহস্য করেননি, সত্যই তার বাবা বিবাহ ক'রছেন।—নইলে, বাড়ী ভরা এতো আত্মীয় স্বজন কেন?

সহসা একটা কথা তার মনে হ'ল। তাই কি? তার বিবাহের কথা পত্রে সমস্তই ত্রিবিক্রমবাবুকে পূর্ব্বেই জানান হ'য়েছিল। এই আত্মীয়-স্বজন সমাগমের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নাই তো! কিন্তু মিথ্যা সংবাদ?

আজ লীলা প্রথমেই গেল তার মায়ের ঘরে। চতুর্দ্দিকে চেয়ে চেয়ে দুটী চোখ তার জলে ভ'রে এলো। কালী আর মাকড়সার জালে ছাওয়া তার মায়ের ফটোখানার পানে চেয়ে চেয়ে আজ মনে হ'ল তার নিজের অপরাধের কথা।

মা! মা! জীবনে কোনও দিনই তো তোমায় মনে করিনি। তোমার আদর যত্ন পাই না পাই, একদিন যে তুমি ছিলে, একদিন যে তুমি আমায় বুকে ক'রেছিলে, আদর ক'রেছিলে, আমার মুখের পানে চেয়ে আমার হাসিটী দেখে হেসেছিলে, এ কথা এতোকালের মধ্যে একবারও আমি মনে করিনি! আজ আমি চোখের জল ফে'লবো না তো কে ফেলবে! এমনই অকৃতজ্ঞ

আমি যে অজ্ঞান হ'য়ে তোমাকে দে'খতে পাইনি তাই এতোদিন তোমার অস্তিত্বকেই ভুলে গিয়েছিলাম।

দাই বুড়ী ঘরে আলো দিয়ে গেল। রাত বেড়ে চ'লল কিন্তু দেখে লীলা আশ্চর্য্য হ'ল যে ত্রিবিক্রমবাবু, তার বাবা ··তাকে না পাঠালেন ডেকে, না এলেন তার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

অভিমানিনীর মনে ক্রমে ভেসে আসতে লাগল কত দুশ্চিন্তা, চোখে গড়াতে লা'গল তার ধারার পর ধারা। পাশে শুয়ে দাই বুড়ী ব'কেই চলেছে কিন্তু লীলার মন তখন কোথায় কে জানে?

পরদিন ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই লীলার আরম্ভ হ'ল নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

কিশোরী কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা, কতো,···কাউকেই লীলা চেনেনা, একে একে সকলেই এসে প্রবেশ ক'রতে লাগল তার ঘরে।

লীলা স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল আর সকলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যেতে লাগলেন। সকলের এতো আলাপ পরিচয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে লীলার বিলম্ব হ'লনা। তাদের সকলের মিলিত প্রশ্ন এবং আলোচনা অবশেষে তাদেব অভিমত শুনে লীলার মনে হ'ল এদের চেয়ে দুর্ম্মুখ লক্ষগুণে ভাল। তার আলোচনার পশ্চাতে বুদ্ধি এবং জ্ঞান ছিল, প্রত্যেকটী টীকা টিপ্পনীর মাঝেও পাওয়া যেত একটা সহানুভূতির সাড়া কিন্তু এ বড় নির্ম্মম, শুধু তাই নয়; বড় নির্লজ্জ! আর একটা কথা লীলার বড় সত্য ব'লেই মনে হ'ল। এক নারী যেমন অসঙ্কোচে এবং অবহেলে অপর এক নারীকে আঘাত ক'রতে পারে, কোন পুরুষ ঠিক তেমনি উলঙ্গ এবং অভদ্র ভাবে এক নারীকে আঘাত ক'রতে কোন দিনই পারে না, যতো কঠোর যতো বড় হৃদয়হীনই সে হ'ক না।

ঘরের বাইরে আসাও ক্রমে লীলার পক্ষে কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল। দিবসের আলো আর রাত্রির অন্ধকারে যে কী পার্থক্য তা যেন সে ভু'লতে বসেছে।

লীলা ভাবে, তার না হ'ক্ চিঠি লি'খবার উপায় নাই কিন্তু তাদেরও কি তাই? রেবা, নীলিমা কি সত্যই তাকে এত সহজে ভু'লতে পারে!

আর একজনের কথা মনে হ'তেই লীলার চোখে জল আসে। সে তো জানেনা এখন সুধা কোথায়,—তার এই বন্দী জীবনের কথা কে তাকে জানাবে!

এমনি সব দুঃসহ চিন্তায় লীলা যখন এক মাসের মধ্যেই একটী বৎসরের পরমায়ু নিঃশেষে শেষ ক'রে দিচ্ছিল তখন ত্রিবিক্রমবাবু এক এক ক'রে রেবার প্রায় দশখানি চিঠিই প'ড়ে প'ড়ে নিজের হাত-বাক্সের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে দিচ্ছিলেন একখানির পর আর একখানি, লীলা কিন্তু এ সবের কিছুই জানতে পারল না।

অবশেষে দীর্ঘ দুটী মাস পরে লীলা চিঠি লিখবার সুযোগ পেল। ত্রিবিক্রম বাবু বিবাহ ক'রতে গিয়েছেন, এ সুযোগ লীলা নষ্ট ক'রল না। রেবার নিকট সে চিঠি লিখল সুলেখার ঠিকানায়। তার পিতার অসুখের সংবাদ ও বিবাহের সংবাদ জানিয়ে লীলা লিখল,—

রেদি! মনে হচ্ছে স্বপ্নের খেলা সব স্বপ্নেই শেষ করে এসেছি। যে নির্ম্মম নিষ্পেষণে প্রতিটী মুহূর্ত্ত আমার রাত্রি এবং দিনকে গ্রাস ক'রছে তাতে মনে হয় এই রূঢ়তাই বুঝি আমার জীবনের সত্য। পেছনে যা ফেলে এসেছি, সব মায়া, তার পানে আবার ফিরে তাকালে হয়তো সে হবে আলেয়া।

আমিই এখন এ রাজ্যের মধ্যে মস্ত বড় একটা দর্শনীয় এবং আলোচ্য বস্তু। কেউ ব'লছে আমি স্বয়ংবরা হয়েছি, কেউ ব'লছে ফিরিঙ্গি, কেউ বা ব'লছে বেহ্ম, আবার কেউ ব'লছে খৃষ্টান। এর উপরেও যা আছে তা তুমি ধারনাও ক'রতে পারনা। যদি শোনো তবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিপত্র-সব রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবে। শুনবে? কেউ কেউ ব'লেছেন; বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের ছুটো রাখলে তাদের চরিত্তির অমনিই হয়!—বুঝলে? এখন ভাবো একবার তোমাদের লীর অবস্থাটা! এতেও দুঃখ ছিলনা, কিন্তু

এর উপরেও আছে। সেটী অতি সুসংবাদ। তোমাদের লীলার শীঘ্রই আবার বিবাহ হচ্ছে। আমি তোমাদের সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করছি। বুঝলে রেদি?—তোমাদের লী'র আবার বিবাহ!

এ জীবনে কতো স্বপ্নই না দেখেছিলাম রে'দি, সবই কি আমার এমনি ক'রে শেষ হবে? পিত্রালয়ে পার্ব্বতী শুধু স্বামী নিন্দাই শুনেছিলেন কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ কি কেউ? ভেবেছিলাম পার্ব্বতীর মত আমিও আমার সব শেষ ক'রে দেব কিন্তু মনে হয় এখনও যেন আশা র'য়েছে অন্তরের প্রত্যেক স্তরে স্তরে।

আশা ও নিরাশাকে সমান ভাবে ওজন ক'রে মনে হয়, কেন মরব শেষ না দেখে? বিবাহ আর একবার কেন শতবার আমার হ'কনা, আমি তো জানি আমার কি গতি। তিনি কোথায়? তাঁকে আমার হ'য়ে তুমি যা কিছু দিও,—বুঝলে? যা জানবার জানিও আর জিজ্ঞাসা ক'র, এই পাষাণীর শাপমুক্তি কবে হবে?

পরে পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখল। আমার নুতন মাকে নিয়ে বাবা শীঘ্রই ফিরছেন। কে জানে তিনি কেমন?—তবে শুনছি তিনি শিক্ষিতা। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাই আমার পালটে গিয়েছে ভাই। তারা বড় নীচ, পুরুষের পাশে দাঁড়াবার সত্যই অযোগ্য। তোমাদের মত মুষ্টিমেয় ক'টী মাত্র নারীর একাগ্র সাধনার ফলে হয়তো তোমরা পরজন্মে পুরুষ হ'তে পারো কিন্তু এই বিরাট 'রাবিশে'র বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নদী পার হ'তে গেলে ডুবে ম'রবে মাত্র, মুক্তি তো পরের কথা। ইতি—

লীলা যে দিন চ'লে গেল ঠিক সেই দিনই রেবা বাড়ীওলার নিকট হ'তে এই মর্ম্মে এক নোটিশ পায় যে এক মাসের মধ্যেই তাদের সে-বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

নোটিশটা পড়ে রেবা ব'লল : আমারা তো চলেছিই ; নোটিশের আর আবশ্যক কি ?

কিন্তু চ'লে যাওয়া সহজ হ'লেও : কোথায় যাওয়া তাই নিয়ে সকলে চিন্তিত হ'য়ে উঠল। কারণ, অভিভাবকহীন তিনটী মাত্র মেয়েকে কেউ বাড়ী ভাড়া দিতে স্বীকৃত হয় না।

ডলি বলে : এই তো ! এই দেশই করে বড়াই, এরাই চায় স্বরাজ ! অভিভাবক যেন সকলের থাকতেই হবে ; মেয়ে হ'লেই হ'তে হ'বে তাকে অধীন !

কলিকাতা সহরে বাড়ী যে পাওয়া যায়না তা নয় ; কিন্তু তাদের সে সব বাড়ী পছন্দ হয়না। কোনও বাড়ীর ভাড়া এতো বেশী, যে তাদের পক্ষে মাসের পর মাস তা' দিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ এখন একটী পয়সা খরচ ক'রতে হ'লেও সেটী তাদের নিজেদের খেটে উপায় ক'রে নিতে হবে।

অল্প ভাড়াতে কোনও বাড়ীর দু তিনখানা ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কিন্তু তাদের চালচলনের সঙ্গে পুরাতন বাসিন্দাদের অমিল হবার আশঙ্কা দু' পক্ষেরই মনে জাগে।—তাই সেখানেও কিছু স্থির হয়না।

রেবা নীলিমা ও ডলি প্রত্যেকেই বাড়ী খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেল, বাড়ী কিন্তু তবুও মিলল না।

বিজনকে ব'ললে সে হয়তো একটা বাড়ী ঠিক ক'রে দিতে পারত কিন্তু তাকে এ বিষয়ে কিছু ব'লতে যাওয়া মেয়েরা পছন্দ করেনা।

নীলিমা ডাক্তারি পড়ে। সময় তার কম। তার উপর রয়েছে তার মেয়ে পড়ানো। এই 'টিউশন' না থাকলে তার নিজের পড়া চালানই যে কঠিন হবে, তাই বিশেষ ক'রে নীলিমার জন্য রেবা চিন্তিত হ'য়ে প'ড়ল।

এদিকে লীলা সেই যে গিয়েছে আর তার কোনও সংবাদই নাই ! তার কথা চিন্তা ক'রে রেবা আরও বিপন্ন হ'য়ে উঠল। সুধা এলে তাকেই বা সে কি ব'লবে !

সেদিন মেসে ফিরেই দেখে সুধা ব'সে আছে।

লীলার সংবাদ শুনে সুধার ভাবান্তর হ'ল, রেবা তা লক্ষ্য ক'রল, ব'লল : পাঠিয়ে কি অন্যায় করেছি কিছু ?

সুধা উত্তর ক'রল : অন্যায় হ'য়েছে…তাতে কোন সন্দেহই নাই…

রেবার মুখ মলিন হ'ল।

সুধা ব'লতে লা'গল : ‥তবে সে অন্যায় তোমার নয়, লীলারও নয়, সে অন্যায় আমারই।

অভিভূতের মত রেবা সুধার মুখের পানে তাকাল।

সুধা ব'লে চ'লল : নিজের উপর আমার একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল। আর এই বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে তোমাদের মত কতো বার কতো লোককে যে আমি আঘাত করেছি তা আজ ব'লতে চাইনা। সে দিন আঘাত দিয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। ভেবেছি, ওদের একটু শিক্ষা দিলাম। মনে ক'রে দেখ তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা। আঘাত সেদিন তোমাকেও আমি কম দেইনি কিন্তু এতোদিনে আরম্ভ হ'য়েছে সে সমস্তের প্রতিঘাত।

সুধা নীরব হ'ল। রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : হঠাৎ এসব কথা তুলছো কেন ?

সুধা উত্তর ক'রল : কারণ হ'য়েছে ব'লেই তুলছি।

তারপর ক্ষণকাল মৌন থেকে আবার সে ব'লে চলল : সেদিন বুঝিনি কিন্তু আজ বেশ বুঝতে পারছি যে আমার নিজের মনেও মোহ সেদিন তোমাদের কারো থেকে কম ছিল না। তাই তোমরা যখন এই বে'র আয়োজন ক'রলে তখন আমি ঠিক এই সব চিন্তা করেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তখন অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছিল, তাতে বে না ক'রেও আমার উপায় ছিল না। তোমাদের মতের বিরুদ্ধে তখন আমি যা-ই

ব'লতাম না কেন, তোমরা বিশ্বাস ক'রতে না, ব'লতে, এ সব বাজে কথা· তাই আমি চুপ ক'রেই ছিলাম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে এমনি ভয়ানক একটা কিছুর আশঙ্কাই করছিলাম।

সুধার এতো কথায় রেবার অন্তরে জাগল শুধু অসংখ্য প্রশ্ন। কিছুই সে বুঝতে পারছিল না অথচ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতেও যেন তার ভয় হচ্ছিল।

সুধা ব'লল : প্রথম যেদিন তোমাদের সঙ্গে 'লেকে' আমার দেখা হয়, সেদিন যদি লীলাকে আমি চিনতাম তা' হ'লে হয়তো এমনটা হ'ত না। যে মুহূর্ত্তে আমি জেনেছি সেই মুহূর্ত্ত হ'তে তোমাদের সংস্রব ছাড়তেও কম চেষ্টা করিনি কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা এসে ঠিক জড়িয়ে ফেললো।

সুধার কথায় রেবার মনে হচ্ছিল যেন সে জলে পড়ে গিয়েছে। আর সে জলের কূল নাই, কিনারা নাই, আছে শুধু তল,······সে সেই অতলের পানেই ধীরে ধীরে তলিয়ে চলেছে। কোন রকমে সে বলতে পারল শুধু : আপনি কি লীলাকে চিনতেন ?

সুধা উত্তর ক'রল : লীলাকে চিনতাম না তবে তার বাবাকে চিনতাম।

সুধার জীবনের কাহিনী ত্রিবিক্রম বাবুর চরিত্রের কথা শুনতে শুনতে রেবা যেন কোন দূর স্বপ্নরাজ্যে চলে গেল।

সেখানে পিতামাতা নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, অর্থ সম্পদের জাঁকজমক কিছুই নাই,···যেন সে এক বিরাট মরুভূমির দেশ। মাটীর বুক থেকে সেখানে মানুষ জন্ম নেয়, প্রখর সূর্য্যের তাপে মাটী খুঁড়ে মানুষ দিনান্তের আহার পায়, দিনের শেষে দূরের ঝর্ণাধারা থেকে গণ্ডুষে জলপান ক'রে শ্রান্তি দূর করে, রাত্রির নিঃসীম গাঢ় অন্ধকারের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চলে সেথায় মনের মিতালি। তারপর দিনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার উদরের দায়ে মাটী খোড়া··· তারপর এক রক্তসন্ধ্যায় উদার আকাশের পানে চেয়ে সেই চিরউদার মাটীর বুকে অন্তিম শয়ন ·····

ডলির কণ্ঠস্বরে রেবা মুখ তুলে দেখল সুধা চ'লে গিয়েছে আর তার আবছায়া ভরা ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তার আলোকমালা। অবসাদ ও শ্রান্তিতে রেবার মন এতোদিনে যেন তিক্ত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল তার, এ যেন জীবন নয়, জীবন এতো হাল্কা, এতো ফাঁকা ও মিথ্যা নয়; এ শুধু জীবনের একটা নীরস অভিনয় মাত্র। কিন্তু জীবন কি, কোথায়? কে ব'লে দেবে?······

ডলির কথায় রেবা আবার তার অন্তরের হৃতশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা ক'রল কিন্তু তার প্রত্যেক কথায়ই আজ বাজতে লাগল একটা বিদ্রোহের সুর।

ঘরে ঢুকেই হতাশার সুরে ডলি ব'লল: না, আর কোন আশা নাই। সব ছেড়ে কেটে দিয়ে চলো যাই দিব্বি আরামে গিয়ে পুরুষের ঘাড়ে চেপে সুখভোগ করা যাক্।

তার কথায় রেবা ব'লল: এতোই কি সোজা ডল্। আজ যাকে কষ্ট ব'লে এড়াতে চাচ্ছ, সংসারে গিয়ে সংসারের সুখের তুলনায় তখন আবার এরই জন্ম কেঁদে আকুল হবে।—সংসার এতো সুখের স্থান নয়। আজ তোতে আমাতে এমনি নির্ব্বিবাদে থাকতে পারছি কেন জানিস?

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল: কেন?

—তোর সঙ্গে আমার রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই ব'লেই। এই, আমরা সকলে যদি বোন হ'তাম তবে এতো শান্তি আমাদের মধ্যে কিছুতেই থাকতো না।

ডলি প্রশ্ন ক'রল: এর কারণ কি?

এর কারণ, যেখানে রক্তের সম্বন্ধ সেখানেই আমাদের দাবী। আমার জন্ম তার এই করা উচিৎ, আমাকে তার এই দেওয়া উচিৎ। সকলের অন্তরেই এই পাওয়ার নেশা আজ ন্যায় অন্যায়ের আইনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ

নিজের বেলায় একথাটা সকলেই ভুলে যায়। তার উপর আজ সহ্য এবং উপেক্ষা ক'রবার শক্তি, তেমনি মনের বলও কারো নাই। এতো গেলো তাদের কথা। তোমরাই কি এতোদিনের শিক্ষা, রুচি, একদিনেই সব ভুলে যেতে পারবে?

ডলি ব'লল: তা কি কেউ পারে নাকি আবার? ভালই হ'ক মন্দই হ'ক শিক্ষার একটা ফল আছেই, আর তাকে একদিনে অর্ডার মাফিক কেউ পাল্‌টাতে পারে না। এতো আর দর্জ্জির দোকানের জামা নয়!

রেবা ব'লল: সংসারে যেতে হ'লে অর্ডারি জামা কেন, হ'তে হ'বে 'ইলাষ্টিক'। যার যতটুকু দরকার সে ততটুকু টানবে আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও হ'বে বাড়তে, ক'মতে; ছিঁড়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে। নিজের মা বাপ, ভাই বোন অথবা অন্যান্য পরিজনের অন্যায় দেখেও থাকতে হবে চুপ ক'রে। পারবে?

তা' কেন পারব!

—কি করবে? প্রতিবাদ? প্রতিকার? তোমার সে কাজ নয়, তার জন্য সংসারে পুরুষ আছে। তুমি প্রতিবাদ ক'রলে আরম্ভ হবে কলহ, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি।

—কিন্তু পুরুষ যদি ভুল করে?

—তা ব'লবার তুমি কে? পুরুষ ভুল ক'রলেও সে পুরুষ। তার হাতেই ন্যায় অন্যায়ের দণ্ড, আর তুমি যতো বড় বিদূষীই হও না কেন; তোমার জন্য রয়েছে হাতা আর বঁটি,...হেঁসেলের সাম্রাজ্য।

ডলি ব'লল: বাঃ, একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি!

রেবা ব'লতে লাগল: সংসারে মেয়েদের যেটুকু অধিকার আছে বধূদের আজ তা-ও নাই। এভিন্ন আরও কতো রকম অত্যাচারই যে হচ্ছে! এমন পুরুষও সংসারে আছে যারা বাইরে মেয়েদের সঙ্গে নির্ব্বিচারে মিলেমিশে

থাকেন আর বাড়ী এসে নিজের সেই অভিজ্ঞতার মাপকাটিতে বিচার ক'রে স্ত্রীকে জানলার কাছে দাঁড়াতে দেখেই অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন। ঠিক তাই কোন মেয়েও আজ তার স্বামীর চরিত্রে বিশ্বাস করেনা। দু'পক্ষেই আজ এমনি চাপাচাপি। একদিকে বিংশশতাব্দীর আলো, তার শিক্ষা, দাবী, অন্যদিকে এতোদিনের অন্ধ জড়ত্ব। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, মানুষের মনে, সর্ব্বত্রই আজ তাই এই বিপ্লব। এমনি বিপ্লবের দিনে সতীত্বের দোহাই, আমি নর ও নারী দুদিক থেকেই বলছি—মস্ত বড় একটা ভড়ং ভিন্ন কিছুই নয়। নিজের অন্তর থেকে যতোক্ষণ এ প্রেরণা না আসবে ততক্ষণ পরের বক্তৃতা বা উপদেশে মানুষ পারেনা সৎ হ'তে।

রেবার কথায় ডলি বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে উঠল : রেদি ! তুমি বলছ কি ?

আমি ঠিকই বলছি। মানুষ সৎ বা সতী হ'তে পারে কখন, কোন অবস্থায় ?

পৃথিবীর আর আর দেশগুলির অবস্থা দেখ, ওটাকে একটা 'সেন্টিমেন্টে'র রূপান্তর বই আর কিছুই মনে হ'বে না।—তার কারণ, যারা ভগবান মানে না, যাদের জীবনে ভগবান নাই, পরকালের বালাই নাই, অক্ষয় স্বর্গবাস অথবা মোক্ষের মোহ নাই তাদের ঐ সতীত্বের মহিমাই বল, আর মোহই বল পারেনা স্পর্শ করতে।

ডলি ব'লল : কিন্তু আমরা তো ভগবান মানি।

—নিরুপায়ে। যখন অন্য কোন উপায় থাকেনা তখন ঐ ভগবান। তেমন সৎ বা সতীরও অভাব নাই। মনে আছে কি,—'সুযোগ বা দুর্যোগ যাকে পিছলে পড়বার অবকাশ দেয়নি তার দাঁড়িয়ে থাকায় তেমন কোনও বাহাদুরি নাই' ?

রেবার কথায় দোমামনা সুরে ডলি ব'লল : কিন্তু সত্যিই কি আমরা ভগবান মানিনা ?

রেবা ব'লল : কই ? অনল বা অনিলকে তো তোমরা আর পূজা করনা। আজকের দিনে আমাদের মা বাপ, অথবা শ্বশুর শাশুড়ী নুড়ি পূজা, গাছ পূজা করেন আর অলক্ষ্যে ছেলে মেয়ে অথবা বৌ পূজার আয়োজন ক'রে দিতে দিতে মুখ টিপে টিপে হাসে। বিজ্ঞান তোমাদের যে জ্ঞান দিয়েছে তাতে তো আর তোমাদের স্বর্গের প্রয়োজন নাই, তাই মুক্তির লোভ লালসা নাই, তাই নাই সতীত্ব বা পুণ্যের মোহ। এ যুগ জানে, বিজ্ঞানই মুক্তিদাতা এই জগতই সত্য আর সকলের চেয়ে বড় সত্য মানুষ, তার অনন্ত সুখ দুঃখ বাসনা কামনা।

ডলি ব'লল : কিন্তু তাওতো ঠিক হ'চ্ছে বলে মনে হয়না।

কেমন করে হবে! তাই তো ব'ললাম তখন। আমরা দুই যুগের দুই ভিন্ন মতাবলম্বী, সমাজ জীবন এবং ধর্ম্ম নিয়ে ক'রছি টানা হেঁচড়া। যতোক্ষণ পর্য্যন্ত এই টানা হেঁচড়া চলবে ততদিন কোন পক্ষই শান্তি পাবেনা। জ্ঞানে অজ্ঞানে, উভয় পক্ষের শিক্ষা, রুচি পরস্পরকে ক'রছে আঘাত। তাইতো এই নিন্দা, কলহ, কুৎসা।

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল : ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার কি মত ? আমার তো মনে হয় ধর্ম্ম তেমনিই অক্ষুন্ন রয়েছে।

হেসে রেবা ব'ললে : তুই কি পাগল হ'য়েছিস্! সামাজিক জীবনে যেখানে বিশৃঙ্খলা, ধর্ম্ম কি সেখানে থাকতে পারে ? এতোক্ষণ ধরে এতো সব তবে ব'ললাম কি ? ধর্ম্মে যে আমরা ঠিক আছি তা কি ক'রে বুঝব···যতোক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মই হ'লনা ঠিক। ধর্ম্ম ব'লতে তো অনেকই আছে, কোনটায় আমরা ঠিক আছি ? বিশেষ ক'রে আমাদের বাঙলার কথাই হ'ক্। অনেক হিন্দু দেখবে তুমি যাঁরা মসজিদ দেখলেও কপালে হাত ঠেকান আবার তেমনি অনেক মুসলমানও আছেন যারা দুর্গা পূজার সময় প্রতিমা দেখতে বা প্রসাদ আশীর্ব্বাদ নিতে দ্বিধা করেন না। আবার প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবার মাত্রেই আচারে ব্যবহারে

একটা দিক রেখেছেন পুরোপুরি ব্রাহ্ম আর অন্তর,—কঠিন গোড়া হিন্দু। তেমনি আবার ব্রাহ্মরাও মুখে করেন মূর্ত্তিকে পরিহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে দেন প্রতিমুহূর্ত্তেই রূপের পরিচয়, তার আভাস।

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল : কি ক'রে ?

না কি ক'রে ? প্রত্যেক কথায়, কবিতায়, বেদ-পুরাণের ঐসব আলোচনায় মূর্ত্তি কোথায় লুকিয়ে থাকে ? রূপের বিকাশেই যখন জগৎ তখন মূর্ত্তিকে এড়িয়ে যেতে কে পারে ?—সকলের মত তারাও পারেন না।

ডলি বুঝল রেবার এই বাগ্মীতা ও জ্ঞান সুধারায়ের বন্ধুত্বের ফল। একে সে উপেক্ষা ক'রতে পারছেনা কিন্তু মন যেন ঠিক সরলভাবে সমস্তকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা বোধ ক'রছে। নীরবে সে ভাবতে লাগল।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর রেবা ব'লতে লাগল : ব্যাভিচার আজ না কোথায়! সুধাদা যে বলেন, তা মিছে নয়!

ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল : কি ?

সকলে মিলে সংসারটাকে ক'রে তুলেছেন শ্মশান কিন্তু শাস্ত্রটা ধ'রে ব'সে থাকবেন সেই তপোবন যুগের।

কিন্তু সুধা দা এর কারণ কিছু ব'লতে পারেন ?

ডলির কথায় রেবা ব'লল : পারেন বই কি ? বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান।

কিন্তু, এর প্রতিকারের উপায় ?

উচ্চারণ ক'রবার শক্তি নাই। তাই যদি থাকতো তবে সে কারণ দূর করাও যেত। তবে এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে যে, এ-জীবনে যে সুখকে উপেক্ষা ক'রেই একদিন আমাদের দেশের মানুষ সুখী হ'য়েছে, শান্তি পেয়েছে, সুধাদা বলেন যে সেই সুখকে এই জীবনে, মাটীর উপরে টেনে এনেই আরম্ভ হ'য়েছে আমাদের জীবনের দ্বন্দ্ব, এই ব্যাভিচার, অসন্তোষ

এবং অশান্তি। এর বেশী ব'লতে গেলে তার ফল বিশেষ ভাল হবেনা।

ডলি প্রশ্ন ক'রল : সুধাদার সমস্ত কথা, সব যুক্তিতর্ক তুমি বিশ্বাস কর ?

—করি। আজ আমার সব থেকেও কিছু নাই কিন্তু তাতেও আমি অসুখী নই। তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানে হ'ক আর অজ্ঞানেই হ'ক যেটুকু পাবার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি…আমি জানি তাই আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ; যা আমি পাইনি বা পাবনা তার জন্য আমার অভাব নাই তাই অভিযোগও নাই।

অন্ধকারের মধ্যেও ডলির মনে হ'ল রেবার দুটী চোখে যেন শুকতারার জ্যোতি।

সহসা তার দুটী হাত চেপে ধরে রেবা ব'লে উঠল : কিন্তু ডল্ লী', যেন কোনও দিন আমাকে ভুল বুঝবার অবকাশ না পায়। সাবধান।

কোন কথা না ব'লে ডলি তার রে'দির দুখানি হাত গভীর আগ্রহে চেপে ধ'রল।

পরদিন রেবার যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হ'য়েছে।

নীলিমা তখন হাসপাতালে। ডলি একখানা চিঠি এনে তার হাতে দিয়ে ব'লল : এই নাও তোমার বিপদভঞ্জন তোমার সকল দুঃখের অবসান ক'রেছেন।

আমার বিপদভঞ্জন মানে ? ব'লতে ব'লতে রেবা চিঠিখানা পড়ে ফেলল।

সুধা লিখেছে. তার হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে বাস ক'রতে মেয়েদের কোন আপত্তি না থাকলে এই দারোয়ানকে দিয়ে তাদের মালপত্র সমস্ত সেখানে পাঠিয়ে দিতে। অবশিষ্ট যা কিছু সে-ই দেখে শুনে ক'রে দেবে। রাত্রে সেখানেই সুধার সঙ্গে দেখা হ'বে।

রাত্রে সুধার সঙ্গে দেখা হ'তে ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল : বাড়ীর ভাড়া নেবেন না সুধাদা ?

সুধা ব'লল : নিশ্চয়ই, নেব বই কি, তবে নগদ না হ'লেও আমার আপত্তি নাই।

রেবা ব'লল : তার মানে ?

তার মানে অমনিই তোমাদের থাকতে দেবনা, একটা কিছু করতে হ'বে।

—একটা কেন ? ক'রতে আমরা সবই পারি কিন্তু করাবে কে ? সে ভারটা নিতে হ'বে তোমাকেই।

সুধা ব'লল : তথাস্তু।

আবার মেয়েরা নতূন উদ্যমে কাজ ক'রতে আরম্ভ ক'রল। সকলেরই মন যখন খানিকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে তখন অতর্কিতে এসে উপস্থিত হ'ল লীলার চিঠি।—প'ড়ে রেবা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

সুধা ব'লল : এখন আমার সেদিনের কথাগুলি একবার মিলিয়ে নাও।

রেবা ব'লল : কিন্তু কি করবে এখন ? এমনি ক'রে চুপচাপ থাকলে সে যে মরে যাবে।

হেসে সুধা ব'লল : যার সঙ্গে তোমরা জড়িয়েছো তাতে মরণ বাঁচন তোমাদের একই হ'য়ে দাঁড়াবে।······তবে, তোমাকে ভাবতে হ'বে না, যা হ'ক আমি করব।

রেবা ভেবে বুঝতে পারলনা সুধার একথায় তার মন এমন খুসী হ'ল কেন ?

উক্ত ঘটনার পর বেশ কিছুকাল চ'লে গিয়েছে।

আজকাল রেবা ও ডলির মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নেবার অবকাশ হয়না। নারী-শিক্ষালয়ের কাজ নিয়ে তারা প্রাণপাতে পরিশ্রম ক'রছে।

দিনে তিনবার মেয়েদের ক্লাস হয়। সকল শ্রেণীর নারী এবং বালিকাদের এখানে শিল্প কার্য্য, গৃহ কার্য্য, সঙ্গে বাংলা এবং ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। রবিবার দিন হয় সঙ্গীত এবং অন্যান্য বিশেষ কোনও বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা।

এ ভিন্ন নারী শিক্ষালয়ের আর একটী বিভাগ আছে, সরল কথায় তাকে বলা চলে হাসপাতাল।

বীরেন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের ফলে এ সব বিষয়ে সুধার চিন্তা আজকাল খানিকটা লাঘব হওয়ায় মেয়েদের কাছে হ'য়ে পড়েছে সে দুর্লভ।

সেদিন রেবা ও ডলি আফিসঘরে বসেছিল এমনি সময় দরোয়ানের সঙ্গে যে রমণীটী ঘরে প্রবেশ ক'রল তার পানে তাকিয়ে রেবা যেন অকারণেই বিস্মিত হল।

আগন্তুকা জিজ্ঞাসা ক'রল : পিনাক বাবু এখানে থাকেন কি ?

রেবা ব'লল : বসুন।

রেবার মনে হ'ল মেয়েটীর বয়স বোধ হয় তার চেয়ে কিছু বেশীই হবে কিন্তু এমন সুন্দরী সে কখনও দেখেছে ব'লে মনে ক'রতে পারল না।

মেয়েটী ব'সে ব'লল : পিনাকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হবে না ?

রেবা জানাল যে পিনাক এখন কলিকাতায় নাই তবে হয়তো আজ রাত্রেই ফিরতে পারেন।

মেয়েটী এবার জিজ্ঞাসা ক'রল : অপনিই কি রেবা দেবী ?

রেবা উত্তরে ব'লল : হ্যাঁ, কিন্তু কি ক'রে জা'নলেন আপনি ?

যে মহৎ কাজ নিয়ে আপনারা সংসারে এসেছেন তাতে আপনাদের জানা খুব শক্ত নয়। তবে পিনাকবাবুর পরিচয় পাবার সৌভাগ্য বহু পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম। আপনারা তো তাঁরই বোন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রেবা ব'লল : বলুন আপনার কি কাজ আমরা ক'রতে পারি ?

মেয়েটী ব'লল : ক'রতে আপনারা অনেক কিছুই পারেন কিন্তু···

ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার সে ব'লল : শুনেছি ভাগ্য যাদের পরিত্যাগ করে সেই সব হতভাগীদের আপনারা আশ্রয় দেন, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রেবা ব'লল : ঠিক তা নয়, সকলকেই যে আমরা আশ্রয় দিতে পারি তা নয়, কারণ এখনও আমাদের তেমন অর্থবল হয়নি।

ডলি ব'লল : এইতো এখন এখানে যে পাঁচটী মেয়ে আছে, কোনও হাসপাতালেই তাদের স্থান হয়নি। আমরাও যদি তাদের আশ্রয় না দিতাম তবে হয়তো গঙ্গায়ই তাদের আশ্রয় নিতে হ'ত, না হয় ফুটপাথে পড়েই ম'রতে হত।

ওঃ ! ব'লে মেয়েটী মুখ নত ক'রল।

ডলি ব'লল : কিন্তু আপানাকে দেখে রোগী ব'লেও মনে হয়না, ভাগ্যের উপেক্ষিতা তো নয়ই ; আপনি এ সব জানতে চাচ্ছেন কেন ?

মেয়েটী উত্তর ক'রল : বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য মনে হয়না স্বীকার করি কিন্তু দেহের অলঙ্কার আর অন্তরের অভাব মেটাতে পা'রছে না। আপনার দৃষ্টি যদি ঐ অলঙ্কার ছেড়ে আমার ভিতরে পৌঁছত তবে বু'ঝতে পারতেন দেহের এই অলঙ্কারের মূল্য হিসাবে অন্তরের কতোখানি তাকে বিক্রি ক'রতে হ'য়েছে। ···যার ফলে আজ সে দেউলিয়া।

রেবা ব'লল : আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, আপনাকে আঘাত দেবার জন্য ও একথা বলেনি কিন্তু।

সে আমি বুঝেছি। ব'লে মেয়েটী আবার দৃষ্টি নত ক'র্ল। পরে ব'লল: আমি চেয়েছিলাম আপনাদের সঙ্গে কাজ ক'রতে।

রেবা ব'লল: কিছু মনে ক'রবেন না, আপনার পরিচয়?

মেয়েটী উত্তর ক'রল: সাধারণের চোখে ডালিম পতিতা হলেও পিনাক বাবু জানেন প্রতিমা ঠিক তা নয়।

বেশ, কাল আর একবার আসবেন। ব'লে রেবা আবার প্রশ্ন ক'রল: এর আগে কি কাজ করেছেন?

ম্লান একটু খানি হেসে মেয়েটী উত্তর ক'রল: দুর্ভাগ্যবশতঃ ছলনা প্রতারণার পরীক্ষা দেবারই সুযোগ পেয়েছি শুধু কিন্তু শিখেছিলাম একদিন সবই। আমার বাবা সেকেলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হ'লেও শকুন্তলার সঙ্গে শেলি বা বায়রন পড়াতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল না। তা' ভিন্ন গাইয়ে বাজিয়ে বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

মেয়েটীর কথায়, রেবা এবং ডলি উভয়েই বিস্মিত হ'ল। আরও কিছু সময় কথাবার্ত্তা ব'লে মেয়েটী বিদায় নিল।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: কেমন লাগল ডল্?

ডলি উত্তর ক'রল: মন্দনা! নতুন রকম যা হ'ক্।

হ্যাঁ, বেশ ধার আছে, ওজনও কম নাই তবে ইস্পাতের অংশই বেশী ব'লে মনে হ'ল।

সে দিন অনেক রাত্রে সুধা এসে উপস্থিত হ'ল। সুধা দেখে বিস্মিত হ'ল যে দরজা খুলে দিল রেবা। ব'লল: এতো রাত অবধি তুমি জেগে রয়েছ কেন? দরোয়ান কি আজকাল দরজা খু'লতে ভুলে গিয়েছে নাকি?

উপরে যেতে যেতে রেবা ব'লল : ঘুম আসছিলনা তাই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। দে'খলাম তুমি এসেছ তাই...

এ রকম ঘুম না-আসা তো ভাল না।

সুধার কথায় রেবা নীরবেই হাসল। সুধা আবার ব'লল : ক' রাত এমন হ'চ্ছে ?

কপট বিরক্তিতে রেবা ব'লল : যাও আমি জানি না।

এবার সুধাও মৃদু হেসে নীরব হ'ল।

বাঃ ! এমনি ভাবেই শুয়ে প'ড়লে যে !

ব'লতে ব'লতে রেবা জুতা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সুধা নিজেই জুতা খুলে দূরে সরিয়ে দিল পা দিয়ে, জামাটাকেও ছুঁড়ে দিল আলনার উপর।

জুতা এবং জামা যথাস্থানে রাখতে রাখতে রেবা ব'লল : বনের বাঘ খাঁচায় ঢুকলে বুঝি এমনই হয় ?

হ্যাঁ, তবে শিকারীর গুণে।

রেবা ব'লল : নইলে, বলো দেখি অগোছানো ক'রে কি ভাল লাগে ?

হ্যাঁ, যখন দেখি আগোছানোটা আবার গোছানো হ'চ্ছে........

সুধার কথা শেষ হ'লনা, রেবা ধমক দিয়ে ব'লল : নাও, ওঠো আর দেরী ক'রনা।

কপট ভয়ের স্বরে সুধা ব'লল : কোথায় উঠব ?

তার ভাব দেখে রেবা হেসে ফে'লল। ব'লল : না আর রাত ক'রনা, হাত মুখটা ধুয়ে এসো।

সুধা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে রেবা স্টোভ ধরিয়ে লুচি বে'লতে ব'সল। বেলুনের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সরু দু' গাছা চুড়িতে শব্দ হচ্ছিল ঠুঙ ঠুঙ ঠুঙ। লুচি ক'রতে ক'রতে রেবা নিজের খেয়ালে গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে আরম্ভ ক'রেছিল। সুধা কিছু সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। সত্যই রেবাকে তখন মনে হচ্ছিল সুন্দরী, সুখী; অত্যন্ত সুখী। সুধা ভাবছিল এই কি সেই বোটানিকাল গার্ডেনের সেই সন্ধ্যার মিস্ রে!—না, কোনও নিদর্শনই তো আর নাই তার।

খেতে বসে সুধা জিজ্ঞাসা ক'রল: তারপর, নতুন খবর আছে কিছু?

সে সব পরে, আগে খেয়ে নাও। ব'লতে ব'লতে রেবা থালার উপর কয়েকখানা লুচি তুলে দিল।

সর্ব্বনাশ! আমি পেটুক হ'তে পারি কিন্তু পেট সর্ব্বস্ব নই। এতো সব রাখব কোথায়?

সুধার কথায় রেবা ব'লল: তুমি যে মুখ সর্ব্বস্ব তা' আমি জানি।

ব'লতে ব'লতে রেবা আরও লুচি তুলে দিল কিন্তু সুধা তা লক্ষ্য ক'রলনা।

মুখ ধুয়ে এসে সুধা যখন চুরুট ধরাচ্ছিল তখন রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: আচ্ছা! ক'খানা লুচি তুমি খেতে পার?

ক'খানা আর! কিছু সময় নীরব থেকে সুধা উত্তর ক'রল: বোধ হয় খান দশেক পারি খেতে—

তাতেও সন্দেহ আছে,···না? কিন্তু আজ ক'খানা খেয়েছ, জানো?

ক'খানা?

সাতাশ খানা।

সে কি! সুধা আৎকে উঠে পরক্ষণেই ব'লল: না না। এ কেন ব'লছ আমি জানি।

কেন বলো দেখি?

রেবার কথায় সুধা ব'লল : কালও ঐ সাতাশ খানা দিয়ে ব'লবে, কাল খেতে পা'রলে আর আজ পা'রবেনা কেন ?

রেবাও হা'সল। হেসে ব'লল : আচ্ছা তাই যদি করি, সত্যি ক'রে বল দেখি সেই সাতাশখানা খেতে তুমি পা'রবে কি না ?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে সুধা হা'সতে লা'গল।

রেবা ব'লল : তুমি যা যুদ্ধে গিয়েছিলে আর হাবিলদার হ'য়েছিলে, তা' আমি বেশ বু'ঝতে পেরেছি।

সুধা উত্তর ক'রল : খাঁচার বাঘ খাঁচায়ই জন্মায় না রেবা। বৃন্দাবনের গোপীরা স্বপ্নেও কোনও দিন ধারণা ক'রতে পারেনি যে তাদের ঐ বসন চোরার মাথায় কুরুক্ষেত্রের আগুন জ্ব'লছে। বুঝলে হে ?

রেবা উত্তর ক'রল : হে আর কোত্থেকে বুঝবে, বল ? নিভার চিঠিতে জানলাম সে নাকি এখন তার দোজ বরের ঘরে বন্দী।

সুধা ব'লল : কেন, প্রথম বর কি দোষ ক'রল ? যাক্! আমি সে কথা বলিনি।

তেমনি দুষ্টুমিভরা হাসির সঙ্গে রেবা ব'লল : নি ? সে তো এখন হাসপাতালে।

ওঃ ! হা'সতে হা'সতেই সুধা ব'লল : এবার বুঝেছি রে' !

তারপর কিছু সময় ধরে নানা বিষয়ে তাদের আলোচনা হ'ল।

প্রতিমার কথা শুনে সুধা ব'লল : ভাল ভেবেই তাকে নিও তবে মন্দ ভেবে তার সম্বন্ধে সজাগ থেকো। তবে আমার মনে হয় ধাতু খাঁটীই ; পড়েছিল বিকৃত ছাঁচে। আর শোন, আমার খোঁজে কেউ এলে তাকে আগে পরীক্ষা ক'রে নেবে। যদি তাকে সন্দেহ ক'রবার কোন কারণ না পাও ভাল, নইলে সকলকেই আমার সম্বন্ধে কিছু ব'লনা।

সুধার কথায় রেবা নিজের মনে মনেই চিন্তা ক'রতে লা'গল। সুধার

উপর পুলিশের যে সুনজর নাই রেবা তা' জা'নত তাই সে মনে মনে অনেক আশঙ্কা ক'রে শিউরে উঠছিল।

তখন শীতের শেষ।

সুধা কথা ব'লতে ব'লতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পানে দৃষ্টি প'ড়তেই রেবা তার পায়ের কাছ থেকে গোটানো 'রাগটা' খুলে সুধার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে এসে আবার ইজিচেয়ারে বসল।

পরদিন নীলিমার ধাক্কা ধাক্কিতে রেবা চোখ মেলে তাকাল।

নীলিমা ব'লল : বিছানা রেখে এখানে কেন ?—শ্যাম এসেছে নাকি ?

আর এক দিনের কথা মনে হ'তে নীলিমা আবার ব'লল : আমি মনে করেছি, তুই যদি আমার আগে মরিস তবে তোর শ্মশানের উপর একখানা 'ইজি চেয়ার' তৈরি ক'রে দেব।

নীলিমার কথার কোন জবাব না দিয়ে রেবা ভাবছিল, আমি তো মাথায় বালিস দিয়ে শুইনি, তা ভিন্ন এই 'রাগ'···

কিছুদিন পরের কথা।

পশ্চিমের কোনও একটা ক্ষুদ্র সহরের ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে সুধা ছবি আঁকছিল। অদূরের স্টেশনে ট্রেনের শব্দ শুনে সহসা যেন তার চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে সে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল, এমনি সময় বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়াল একখানি এক্কা।

আড় চোখে তাকিয়ে সে দে'খল একটা প্রৌঢ়ের সঙ্গে দুটী যুবতী এক্কা থেকে নেমে তারই সমুখ দিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রল।

কিছু সময় যেতে না যেতেই ভদ্রলোকটা বেরিয়ে এসে ব'ললেন : এখানে নদী, পুকুর কিছু নাই বুঝি ?

সুধা মুখ তুলে ব'লল : না, তবে ঝর্ণা আছে। ঐ স্টেশনেরই পথে।

আপনি এখানে ক'দিন আছেন?

ভদ্রলোকটীর কথায় সুধা উত্তর ক'রল : আছি কিছু দিন আর থাকবোও কিছু দিন। অবশ্য তাই ভাবছি, কিন্তু কতোদিন থাকব কিছু ব'লতে পারিনা ঠিক।

ভদ্রলোকটী অবুঝের মত জিজ্ঞাসা ক'রলেন : কেন বলুন দেখি?

···আজ্ঞে আমি বেদুইন। ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে, আর তা-ই করি।

ভদ্রলোকটী হেসে ব'ললেন : বুঝেছি, বে থা করেন নি এখনও।

ব'লে নিজেই আবার নিজের মনের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিলেন : আর ক'রবেনই বা কি ক'রে, দে'খছি তো আপনি আর্টিষ্ট। যা'ই বলুন আপনি, আর্টিষ্টে দেশটা একেবারে ছেয়ে গিয়েছে।

হেসে সুধা উত্তর ক'রল : সত্যিই! সব আর্টিষ্টগুলো যদি না খেতে পেয়ে এক দিনেই ম'রে যেতো তবে বোধ হয় মন্দ হ'তনা? দেশের বোধ হয় উন্নতি হ'ত, কি বলেন?

ব'লে সে ভদ্রলোকের মুখের পানে তাকাল।

ভদ্র লোকটী জিজ্ঞাসা ক'রলেন : এতে কিছু হয় কি?

সুধা উত্তর ক'রল : কিছু হয় বই কি! নইলে বাঁচছি কি ক'রে?

ভদ্রলোকটী ব'ললেন : ছবি কারা আঁকায় আজকাল?

সকলেই। আপনারা আঁকাচ্ছেন হয়তো বিলাসের বশে আর যাঁরা গরীব তাঁরা আঁকাবেন প্রয়োজনের দায়ে এই আর কি!

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না!

আচ্ছা, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ব'লে সুধা উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোকটী ব'লে উঠলেন : ওকি! আমি না হ'ক তেল মাখছি কিন্তু আপনি দাঁড়াচ্ছেন কেন? বসুন।

সুধা কিন্তু না বসেই ব'লতে লা'গল : এই ধরুন, যার দিনান্তে একমুঠোর সংস্থান নাই, তিনিও 'ফোটো' বা ছবি করান ব'লে কি আপনার মনে হয়? করান না—না? কিন্তু আমি ব'লছি তিনিও করান। তবে তিনি করান হয়তো মৃত পিতার কিম্বা মায়ের একখানি ছবি, যতো কম খরচে করা সম্ভব হ'তে পারে তেমনি ক'রে, আর আপনারা হয়তো করেন উঠতে ব'সতে দাঁড়াতে, নানা রকম ভঙ্গিতে, নানা বেশ ভূষায়। আপনারা মৃতা পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থেও তোলেন, আবার নবাগতার মনোরঞ্জন ক'রবার জন্য তোলেন। আপনাদের হ'ল খেয়াল, বিলাস বা সখ যাই বলুন......

সুধার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে ভদ্রলোক সহসা বলে উঠলেন : আচ্ছা আচ্ছা! পরে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রব, এখন স্নানটা সেরে আসি।

চাকর কাপড় এবং গামছা নিয়ে এসে অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা ক'রছিল, প্রভুর কথায় এবার সে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

ভদ্রলোকটী ঝর্ণার খোঁজে তপ্ত কঙ্করময় পথে বেরিয়ে পড়লেন, যুবকও তার তুলি তুলে নিল। ভদ্রলোকটী দৃষ্টির বাইরে যেতেই পাশের ঘরের দরজার ফাঁকে দেখা গেল একখানি মুখ। কৌতুক ভরা বড় দুটী কাল চোখে যেন রহস্যের ছায়াছবি। অতি সন্তর্পনে একখানি চরণ বারান্দার বক্ষ স্পর্শ ক'রল তারপর আর একখানিও ;—শিল্পী তখন ধ্যানতন্ময়।

শিল্পী এবং ভদ্রলোকের মাঝে পূর্ব্বের দেখা সাক্ষাৎ বা পরিচয় না থাকায় সুধা এবং লীলার সুবিধা বই অসুবিধা হ'লনা।

লীলার পত্রে তাদের এখানে আসবার কথা জানতে পেরে সুধা ত্রিবিক্রম বাবুর সঙ্গে অপরিচয়ের এই সুযোগই গ্রহণ ক'রল।

লীলার উপস্থিতি জানতে পেরেও সুধা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবির উপর তুলি টানছিল।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে লীলা ব'লল : বেশ, তবে তোমার মানসীকে নিয়েই থাকো, আমি চ'ললাম।

ব'লে সে পা বাড়াতেই শিল্পী তুলি ছেড়ে আঁচল ধ'রল।

কে মানসী ? আমার মানসীর রূপ প্রথম আমাকে কে দেখেছিল,… মনে নাই ?

মূর্ত্তি নাহি ছিল জানা<br>
নাহি ছিল ধ্যানের ধারণা,<br>
রহস্যের পরপার হ'তে<br>
কে গো তুমি দিলে হে প্রেরণা ?<br>
স্বপ্ন মোর চিত্তবৃত্তে দিলেহে চেতনা !

ব'লতে ব'লতে শিল্পী অতর্কিতাকে অতর্কিত বাহুর বন্ধনে টেনে নিল,… অতি কাছে, একান্ত নিবিড়তমভাবে। ……

…অতর্কিতা কিন্তু ক্ষণপরেই হ'য়ে উঠল অত্যন্ত চঞ্চল। আঃ ! তুমি তো কম ছেলেমানুষ নও ! ছাড়োনা, আমার প্রথম অধ্যায়টাই যে বাকী রয়েছে।

লীলাময়ী ! বলতে পারো কোথায় তোমার প্রথম আর কোথায়ই বা শেষ ?

লীলাময়ীও কবি, উত্তর করল :…… হে অশেষ !

তোমার চরণতলে আমার সকল শেষ।

ব'লে সে শিল্পীর চরণে প্রণতা হ'ল।

—তাই আজ পিনাকের শঙ্খে বাজে লীলার রহস্য-রেশ !

ব'লতে ব'লতে শিল্পী তার বাম হাতখানি প্রণতার মস্তকে রেখে দক্ষিণ হাতে তার চিবুকখানি তুলে ধ'রে হৃদয়ের নিটোল দ্বারে এঁকে দিল বিশ্বের সম্মোহিনী টীপ…তপ্ত রঙিন তার অধর তুলিকায়। লাজ-রাঙা শিহরণে কেঁপে

উঠে প্রণতা তাকাল উর্দ্ধে শিল্পীর মুখের পানে, প্রদীপ্ত সূর্য্যের পানে যেমন ক'রে তাকায় স্বত্বহীনা সূর্য্যমুখী।

পরক্ষণে সে চমকে উঠে দাড়ালো: মা আসছে! মা! মা হে! আয় না এদিকে মুখপুড়ী।

অপরূপ এই মাতৃসম্বোধনে শিল্পী অবাক হয়ে তাকাল।

আগেই অতটা চমক খেয়োনা গো, একটু যায়গা রেখো, নইলে পরে আর সামলাতে পারবে না।

সত্যই অতর্কিতারই সমবয়সী তার মা এসে যখন ব'লল: আমায় চিনতে পারেন? ··তখন শিল্পীর যেন বিস্ময়ের পরীক্ষা।

তাকে নীরব দেখে হেনা আবার ব'লল: আমায় চিনতে পারছেন না, না?

পারছি, কিন্তু না পারলেই হয়তো ছিল ভাল।

এ কথার পর কেউই যেন কিছু ব'লতে পারছিল না। কিছু সময় পরে সুধা হঠাৎ ব'লল: দিগন্তের কোলে বসে উষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা শুধু অপৌরুষই নয়, নির্ম্মম পাশবিকতা।

হেনা বাধা দিয়ে ব'লল: ও কথা ব'লবে না, উষার বুকে যে লালিমা গোধূলির বুকেও তারি ছায়া—

সে কবির কাছে কিন্তু তাতে উষার বা গোধূলির কি?

কিছুসময় স্তব্ধতার পর হেনা ব'লল: আজ কিন্তু আমি আর তা ভাবতে পারি না। আজ সুখ, দুঃখ ও দুটোকেই সমান ব'লে মনে হচ্ছে।

সুধার বুঝতে বাকী রইল না যে এ শুধু নিরুপায়ের আত্মসান্ত্বনা, নইলে সে বাঁচবে কি ক'রে!

তারপর হেনা সহসা অবান্তর ভাবেই হেসে উঠল বিপুল এক উচ্ছাসে। হাসতে হাসতেই ব'লল সে: আমি কিন্তু বেশ সুখীই। দেখুননা, লীলাকে যদি না পেতাম, তবে যে······ব'লতে ব'লতে সহসা সে থেমে গিয়ে ব'লল: ঐ যাঃ

চা-টা হয়তো ঠাণ্ডাই হয়ে গেল, আমি আসছি। ব'লেই সে ত্রস্তপদে সরে গেল।

—অত ভাল নয়, কর্ত্তা জানতে পারলে একেবারে নতুন রকমে জামাই আদর আরম্ভ ক'রবেন।

যেতে যেতে মুখ না ফিরিয়েই, হেনা সুধার কথার উত্তরে ব'লল: ঈশ্, আর তা হয় না।

হেনা ঘরের ভিতরে চলে যেতে লীলা ব'লল: আমি কিন্তু আমার নিজের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম, যখন ওকে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য ওর পরিবর্ত্তন! নয় কি?

সুধা গম্ভীরস্বরে ব'লল: হু!

নীলীমা পাশ করে চাকুরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে, তার স্থান পূর্ণ ক'রেছে প্রতিমা। প্রতিমা যদিও রেবা এবং ডলির সঙ্গে সমানে খেটে চলে কিন্তু রেবার মনে হয় প্রতিমা যেন সর্ব্বদার জন্যই অন্যমনস্ক।

রেবার ধারণা অমূলক ব'লে প্রতিমা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারা কি এতই সহজ। রেবাকে ভুল বোঝান তবুও সম্ভব কিন্তু অহর্নিশি নিজের অন্তরের যে অন্তহীন প্রশ্ন তাদের প্রতিমা কি বলবে! ······

যখন তখনই মনে পড়ে তার মসজিদ ষ্ট্রীটের বাড়ীর কথা, ময়না দুটীর কথা, ছোট্ট মেনি বিড়ালটার কথা। ঝর্ ঝর্ ক'রে কল থেকে জল পড়ে, আর প্রতিমার মনে হয়···এমনি সময় তার গা ধোবার তাড়া প'ড়ত।···

সেই পাপের স্মৃতি আর সে ভাববে না মনে করে কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবে···তবুও তো তাকে মাঝে মাঝে দেখা যেত।

পরক্ষণেই সে চিন্তা ভিন্ন পথ ধরে। ডালিমই যখন মরে গিয়েছে তখন তার সেই রূপ আর প্রতিমা দেখতে চায় না।

এমনি সব চিন্তার মধ্য দিয়েই প্রতিমার প্রতিমূহুর্ত্ত অতিবাহিত হচ্ছিল কিন্তু একটী দিনের ঘটনা তাকে একেবারেই অধৈর্য্য ক'রে তুলল।

সপ্তাহখানেক হ'ল একটী নূতন রোগী এসেছে, প্রতিমা তার চোখের পানে তাকাতেও যেন পারে না। প্রথম যেদিন সে ভর্ত্তি হয় সেদিন তাকে দেখে সকলেই শিউরে উঠেছিল। মানুষের, জীবন্ত মানুষের আকৃতি যে এমন কদর্য্য, এতো ভীষণ হ'তে পারে, তা বোধ হয় তারা চোখে না দেখলে বিশ্বাস ক'রতেও পারত না কোনদিন। মাথায় ছোট ছোট কেশ, কোটরগত চক্ষু জ্যোতিহীন বিবর্ণ, তার উপর কেশ বিরল দুটী ভ্রূর চর্ম্মই ঝুলে পড়েছে এসে চোখের উপর, অধিকাংশ দাঁতই প'ড়ে গিয়েছে, দু' একটী যা আছে তা যেন মনে হয় কালো পাথরের তৈরি। নাকের দুটী বাঁশী এক হ'য়ে মিশে গিয়েছে, ফলে কথা ব'ললে মনে হয় যেন বাঁশ বনে ঝড় উঠেছে।

ডলি তাকে দেখেই আৎকে উঠেছিল। সে জন্য রেবা তাকে তিরস্কার ক'রে নিজেই যখন তার পানে তাকাল তখন বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে রইল রোগীটীর মুখের পানে। তারপর এক সময় তার চোখ আপনা হ'তেই মুদে এলো।

বীরেন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা ক'রে ব'লল: বাঁচবেনা, শুধু ভোগাতে এসেছে। কিন্তু আপনারা ওকে ঘাটবেন একটু কম। আমার মতে এ সব রোগী ভর্ত্তি না করিয়ে গুলি ক'রে মেরে ফেলা উচিৎ।

রেবা কিছু বুঝতে না পেরে ব'লল: সুধা বাবুর সঙ্গে আপনিও যুদ্ধে গিয়েছিলেন নাকি?

বীরেন ডাক্তার ব'লল: আপনি জানেন না রেবাদেবী মৃত্যু এদের পক্ষে শাস্তি নয় শান্তি। ব'লে ধীরেন ডাক্তার জিজ্ঞাসা ক'রল: আচ্ছা, বলুন দেখি এর বয়স কত?

রেবা অনেকক্ষণ ধ'রে নবাগত রোগীর পানে চেয়ে ব'লল : বলা কঠিন তবে পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বোধ হয়।

হেসে বীরেন ডাক্তার ব'লল : কিন্তু শুনুন এর বয়স এখন মাত্র আটাশ।

বিস্ময়ে রেবা বীরেন ডাক্তারের মুখের পানে তাকাল। বীরেন ডাক্তার ব'লতে লাগল : কুৎসিত রোগ এই বয়সেই দেখুন কেমন ক'রে একে মৃত্যুর কোলে টেনে নিয়ে এসেছে।

তারপর সে তার ডাক্তারি শাস্ত্রের চরম অভিমতগুলি ব'লে যেতে লাগল কিন্তু রেবার কাণে তার একটী কথাও প্রবেশ ক'রলনা। তার চোখের সামনে ভাসছিল সেই ভয়াবহ মূর্ত্তিটি। মনে হচ্ছিল তার এই হয়তো নরকের অপদেবতা, নইলে মানুষের মূর্ত্তি এমন কি হ'তে পারে কখনও !

রেবা আর সে রোগীর কাছেও গেলনা, ফলে তার সমস্ত দায়িত্ব প'ড়ল প্রতিমার ঘাড়ে।

প্রতিমার নিকট জীবন ও মৃত্যু দুই ই সমান তাই সে বাদ বিচারের ধার ধারেনা। নির্ব্বিচারে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে রাতের পর রাত সে কাটাতে লাগল মূমুর্ষুকে নিয়ে।

সে দিন রাত্রি তখন গভীর, চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্তব্ধ। রোগী তার বিছানায় শুয়ে···জেগে কি ঘুমিয়ে কে জানে! বি, টাইমপিসটাই শুধু প্রতিমার জাগরণের সাথী।

'টেবেল্ ল্যমফ্'টাকে রোগীর দিক হ'তে আড়াল ক'রে নিয়ে প্রতিমা টেবিলের কাছে এসে বসল একখানা বই নিয়ে। রোগী চোখ মেলে তাকাল।

'ল্যমফে'র মৃদু আলোক প্রতিমার মুখের উপর এসে প'ড়ছে। স্নিগ্ধ সেই নীল আলোয়···প্রতিমার ঐ চিবুক, গালের একটা পাশ, কাণের ঐ রক্ত দুলটী ···তারই উপরে, ললাটের প্রান্তে চূর্ণ কেশ গুচ্ছ···সত্যই অপূর্ব্ব! সুন্দর ·!

এতো সুন্দর প্রতিমা! প্রতিমা কি মানুষ নয়, সে কি নারী নয়! ঐ রূপ… ঐ দেহ ……..

দে'খতে দে'খতে রোগীর অন্তরের অবশিষ্ট এবং অতৃপ্ত বাসনা সহসা যেন সহস্র দল ফনা বিস্তার ক'রে জাগল। রোগের যাতনা…জীবনের অভিশাপ, যৌবনের জ্বালা, সমস্তই সে নিমেষের মধ্যে ভুলে গিয়ে ধীরে ধীরে উঠে ব'সল। সে যে নারী সে কথা সে ভুলে গেল, প্রতিমা যে নারী সে কথাও সে স্মরণ ক'রতে পা'রল না। তার চোখের সামনে শুধু ঐ রূপ…অনিন্দ্য সুন্দর ঐ দেহ-দণ্ড, আর মনের মাঝে বাসনার অনন্ত নাগিনী! ……

প্রতিমা বইয়ের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে এমনি সময় সরিসৃপের মত একখানি কঙ্কালসার বাহু ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রল।

প্রথমে প্রতিমা কিছু বুঝতে পারেনি, মনে ক'রল হয়তো ডলি কিম্বা রেবা, তাই সে বই হ'তে মুখ তু'লল না।

কিন্তু সহসা এ কি………

কঙ্কালসার দুখানি বাহুর বেষ্টনে প্রতিমা বন্দী…চোখে মুখে তার যেন এক ক্ষুব্ধ আজগরের অবিশ্রান্ত দংশন…স্ফুলিঙ্গশ্বাস, … তপ্ত ..বিষাক্ত…

বিপন্ন প্রতিমা দু' হাতে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রল কিন্তু এ যেন শামুকের চুম্বন, … প্রতিমা আতঙ্কে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল।

তার সেই ভীতি বিহ্বল কণ্ঠের আর্ত্তস্বর রাত্রির স্তূপীভূত নীরবতাকে ক'রে তু'ললো…চকিত, সন্ত্রস্ত!

রোগী তখন প্রতিমাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।…যেন দীপ নিভে যাবার পূর্ব্বাভাস। তার মুখের পানে একবার মাত্র তাকিয়েই প্রতিমা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল, মনে হ'ল তার … … সেই দুটী চোখে জ্বলছে বুভুক্ষিত শার্দ্দূলের রক্ত তৃষা।

কিন্তু রোগীর তখন ভিন্ন রূপ। প্রতিমার মুখের পানে চেয়ে সে ভাবছে তার অতীতের কথা। এমন রূপ, এমনই দেহ একদিন তো তারও ছিল কিন্তু আজ তার এই পরিণতি! কিন্তু তারই যখন নাই, তখন পৃথিবীর অপর কেউ এই অপূর্ব্ব রূপ ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী হ'য়ে বেঁচে থাকবে আর সে তারই চোখের সামনে···এ অসহ্য!

প্রতিমা কতকটা শান্ত হ'য়েছিল। রুগীকে শুইয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সে তাকে ধ'রতে গেল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রোগী তার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ল ক্ষিপ্তা বাঘিনীর মত। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার মনে হ'ল তার দেহের শোণিত, সমস্ত জীবনীশক্তি যেন কে শোষণ ক'রছে! গণ্ডে তার তীব্র এক দংশন জ্বালা!

রেবা এবং ডলি ছুটে এসে দে'খল প্রতিমা অভিভূতের মত বসে আছে, গণ্ডে তার ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু রক্ত কণা। রোগীটী মাটিতে প'ড়ে ধুঁকছে, তারও নাক এবং মুখ দিয়ে গড়িয়ে প'ড়ছে কাঁচা রক্ত।

প্রতিমার অবস্থা দেখে রেবা ছুটল ডাক্তারকে ডেকে আনতে। 'ইন্‌জেক্‌সন্' না ক'রলে ঐ কুৎসিত রোগের বীজাণু যদি একবার প্রতিমার রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তার ফল যা হবে সে যে ধারনাও করা যায় না।

ডলি রোগীর কাছে এসে ধমকের সুরে ব'লল: এ সব কি অরুনা!

কথা বলার শক্তি শেষ হ'য়ে এসেছে তবুও সে রুখে উত্তর দিল: কে অরুণা? আমি কল্পনা!

ব'লে সে অট্টরবে হাসতে আরম্ভ ক'রল। তার সেই বীভৎস হাসিতে ডলির বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। প্রতিমার পানে তাকিয়ে সে ব'লল: আর বাঁচবেনা; দেখছনা প্রলাপ ব'কছে?

প্রলাপ !

মাটিতে মুখ ঘষে, মুখের রক্ত মুছে রোগী ব'ল্তে লাগল : রাত ফুরোলে··· ভোরের আলোয় নেশার ঘোর যখন কেটে যায় তখন পাশে তাকিয়ে সকলের গা-ই ঘেন্নায় ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে ! রাত্রের প্রেম সম্বোধন তখন প্রলাপ ব'লেই মনে হয় !

তারপর সে হাঁপতে লাগল। কিছু সময় পরে আবার ব'লে উঠল : তোমরা তো লেখা পড়া শিখেছ ডলি, বলতে পারো···পেটের ক্ষুধা বড়··· না দেহের ক্ষুধা বড় ?

ব'লেই সে আবার হাসতে আরম্ভ ক'রল বিকট রবে। হাসির সঙ্গে তার নাক মুখ দিয়ে ছুটে বেরোতে লা'গল শুধু কাঁচা রক্ত। ভয়ে আতঙ্কে ডলি দূরে সরে দাঁড়াল।

এই সেই কল্পনা ! বিস্ময়ে সে আর কোন কথা ব'লতে পা'রল না।

ডাক্তার যখন এল তখন কল্পনা বাস্তবের অতি রূঢ় সত্যকে আশ্রয় ক'রে শান্তি লাভ ক'রেছে। ডাক্তার প্রতিমার ক্ষত ধুয়ে দিল তারপর ইন্‌জেকসন দিয়ে ব'লল : না, তেমন আশঙ্কার কিছু নাই।

কল্পনার এই শেষ রাত্রির স্মৃতি যখনই প্রতিমার মনে হয় তখনই সে হ'য়ে ওঠে অধৈর্য্য। মনে ভাবে সে, এই কুৎসিত ব্যাধি যদি আশুবাবুকেও অধিকার ক'রে থাকে ?—প্রতিমা চক্ষে অন্ধকার দেখে। বুঝতে পারেনা সে কি ক'রবে।

সেদিন রাত্রি তখন গভীর। সবাই যখন ঘুমের ঘোরে, প্রতিমা তখন তার বাক্স খুলে বের ক'রল একখানি হ্যাণ্ড নোট। তারপর আবার যথাস্থানে সেখানা রেখে দিয়ে সে চিঠি লিখতে ব'সল আশুবাবুর নিকট।

অনেক জল্পনা কল্পনার পর সে লি'খল :—

শ্রীচরণেষু—

এই সংসারের তুচ্ছ দেনা পাওনার সম্বন্ধই শুধু তোমার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে তোমার যে বন্ধন তা' জন্ম জন্মান্তরের। ভুল মানুষ মাত্রেই করে, তুমি ক'রেছ আমিও ক'রেছি। নইলে, এতো জেনেও তোমাকে দিয়ে আমি হ্যাণ্ড নোট লিখিয়ে নেই কোন বুদ্ধিতে।

ডালিমের হয়তো শত অপরাধ ছিল স্বীকার করি কারণ সে পতিতা কিন্তু বল দেখি প্রতিমার তোমার কি অপরাধ ছিল? দুঃখ হয় তোমার রুচির কথা ভেবে। ডালিমের দরজায় এখনও হয়তো তুমি ছুটে যেতে পার কিন্তু সেই অভাগিনী প্রতিমা, তার কথা সত্যিই কি আর একবারও মনে হয় না? একটী ক্ষণের দর্শন, মাত্র একটী রাতের স্পর্শ-সুখের চরণে যে তার জীবনটা এমনি করে বলি দিতে পা'রল তাকে তুমি কি দিলে এতকাল ধরে?—

যা ক'রেছ আর তা ফিরবেনা, আমার মিনতি এখনও তুমি ফেরো। যদি দয়া হয় তবে যে কোনও দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে। ইতি—

অনেক চিন্তার পর প্রতিমা চিঠিতে কোন নাম না দিয়ে শুধু তার ঠিকানা লিখে আবার ভাবতে আরম্ভ ক'রল। এ ভাবনার যেন তার শেষ নাই।

একবার ভাবছিল ...হয় তো সে এ-চিঠি পেয়েও আসবেনা, আবার মনে হচ্ছিল যদি সে-বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথায়ো চ'লে গিয়ে থাকে! এমনি আশা নিরাশার দোদুল দোলায় দু'লতে দু'লতে সহসা একটা কথা মনে হ'তেই গলায় আঁচল দিয়ে মনে মনেই সে ব'লল: ঠাকুর! অনেক দুঃখই পেয়েছি কিন্তু কোন দিন কোন অভিযোগ করিনি, প্রার্থনাও করিনি কিন্তু আজ আমার প্রার্থনা ...শুধু তাকে সুস্থ রেখ, নিরোগ রেখ, আর তার পরিবর্ত্তনে সাহায্য কর। আর কিছু চাই না।

স্বধা একদিন বলেছিল, যৌবন যা হেলায় ফেলায় নষ্ট ক'রে আনন্দ পায় একদিন বার্দ্ধক্য দীননেত্রে তার পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; অতীতের কথা স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হয়। আশুবাবুর আজ সেই অবস্থা।

যৌবনের উচ্ছল নদীতে একটানা ভাসতে ভাসতে সহসা তিনি বাধা পেলেন।

বিশ্বকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু নিজের মনকে চোখ রাঙিয়ে ভুল বোঝান যায় না।

তলপেটের নিম্নে কিছুদিন হ'ল একটা ঘায়ের মত হয়েছিল কিন্তু আশুবাবু তা' লক্ষ্য ক'রলেও খেয়াল ক'রলেন না! কিছুদিন না যেতেই নিজের মনেই কেমন যেন একটা সন্দেহের কালো রেখা ভেসে উঠল। ভয়ে ভয়েই তিনি ডাক্তারের শরণ নিলেন। ব্যবস্থার কোনরূপ ত্রুটি হ'লনা কিন্তু এতো ক'রেও দুষ্ট সে রোগকে তিনি পারলেননা তাড়াতে। একটি মুখ শুকিয়ে যেতে না যেতেই নূতন আর একটা মুখ তার পাশ দিয়ে দেখা দেয়। এমনি ক'রে প্রায় দুটি মাস চলে গেল, আশুবাবু সুস্থ হতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হ'য়ে তাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হ'ল। সেখানেও প্রায় মাসাধিককাল কাটিয়ে দেহ এবং মনে অকাল বার্দ্ধক্যের তিক্ততা নিয়ে তিনি মেসে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন অত বড় বাড়ীটা প্রায় শূন্য, খাঁ খাঁ ক'রছে; যেন প্রেতপুরী। রমনবাবু বহুদিন হ'ল বাসা ক'রেছেন, ইদানিং বড় একটা খোঁজ খবর নেয়না। অন্যান্য মেম্বাররাও যার যার সুবিধা মত আশ্রয়ে চলে গিয়েছে।

তবুও আশুবাবু আশা ছাড়লেন না। মনে ভাবলেন; যাক্‌না, এ দান গেল; আবার ছক্ পেতে দেখি···নতুন কি ওঠে।

মানুষের অভাব বাড়ে, আশাও বাড়ে, তাইতো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আয় কমে সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিও ফুরায়। আশুবাবুর এখন পুঁজি ব'লতে

বাজারের দেনা ও দুর্ণাম। তবুও নতুন মেম্বারের আশায় তিনি তেমনই ব্যাকুল আগ্রহে পথের দিকে চেয়ে থাকেন কিন্তু যারা আসে তারা মেম্বার নয়, পাওনাদার। দুঃখে অপমানে আশুবাবুর অবস্থা হ'য়ে দাঁড়াল অত্যন্ত শোচনীয়।

আজকাল আশুবাবু দুঃখে প'ড়ে একটু যেন চিন্তা ক'রতে শিখেছেন, মানুষ সম্বন্ধে বিচার ক'রতে তাই আজকাল চেষ্টা করেন।

সেদিন হিতেন যখন পাওনা টাকার জন্য অভদ্র ভাষায় তাগাদা ক'রে পরে যাবার সময় দু' চারটি উপদেশও দিয়ে গেল তখন আশুবাবুর মনে হ'ল একজনের কথা, যার কাছে তিনি নিজেই ঋণী অথচ সকলের নিকট ব'লে বেরিয়েছেন তার বিপরীত। সেই পিনাক তার জন্য অনেক কিছুই ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল অথচ সে তার বন্ধুও নয়।

সেদিনের কথা মনে হতেই মনে হ'ল তাঁর ডালিমকে, বিশেষ ক'রে ডালিমের কয়েকটি কথা।

সেদিন ট্যাক্সিতে ডালিম ও পিনাক যখন কথা বলছিল তখন তাদের সেই আলাপ আলোচনা তার কানে এলেও তাতে মনসংযোগ ক'রবার মত অবস্থা তখন আশুবাবুর ছিলনা। কিন্তু হাসপাতালে শুয়ে নানারূপ চিন্তার ভিতর দিয়ে কেমন ক'রে যেন তার চোখ খুলে গেল। সেই মুহূর্ত্ত হ'তেই আশুবাবু হ'য়ে উঠলেন চঞ্চল। হাসপাতাল মনে হতে লাগল তার যেন জেলখানা, তিনি যেন বন্দী। যেমন ক'রেই হ'ক ডালিমকে তার খুঁজে বের ক'রতে হবে, নইলে তার এ সংশয় ঘুচবেনা, এই খেয়ালই তখন তার মনে প্রবল হ'য়ে উঠলো।

অনেক ক'রে আশুবাবু তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মেসে ফিরে চারিদিকের দেনার তাগাদায় যখন তিনি দিগভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন ঠিক সেই সময়েই প্রতিমার চিঠি তার হাতে পৌঁছল।

দুটি দিন ধ'রে কতোবার যে তিনি চিঠি খানি প'ড়লেন তার ইয়ত্তা হয় না, কিন্তু কিছুই যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

প্রতিমা! প্রতিমা! অস্পষ্ট স্বপ্নস্মৃতির মত একখানি করুণ মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায় যৌবনের পরপার হ'তে। ধরা যায়না ঠিক, তাই ব্যথা তার হ'য়ে ওঠে অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে তার ধূপ কাজল আঁচল উড়িয়ে। কলিকাতার বুকে জলেছে আলোর মালা কিন্তু আশুবাবুর ঘরের মধ্যে আজ স্তূপীভূত অন্ধকার। আলো জ্বালবার কথা আজ তার মনেই এলোনা। তার মনের ভিতর তখন শুধু অন্ধকারই নয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে দুটি শক্তির চলছে একটানা একটা দ্বন্দ্ব। জীবনের, যৌবনের এই ম্লান গোধূলিতে এতোদিনের অর্থহীন উশৃঙ্খলতার কথা স্মরণ ক'রে আশুবাবু বুঝলেন যে তার নিজের এবং এই সংসারের মাঝে তিনি একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে বসে আছেন। এ পার থেকে ও পারে যাবার উপায় তার নাই। অথচ এপারের নিশ্বাস আর তার সহ্য হচ্ছেনা। বাঁচতে হ'লে ওপারে তাকেই যেতেই হবে। কিন্তু কেমন ক'রে যাওয়া? প্রতিমা হয়তো জানে, সে হয়তো পারে তাকে এ পার থেকে ও পারে নিয়ে যেতে কিন্তু কোন মুখে আজ তিনি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন! ডালিম যদি ডালিমই হ'ত তবে কথা ছিলনা কিন্তু সে যে প্রতিমা। যে প্রতিমা হিন্দুর কুলবধূ, নির্জ্জন ঘরের মধ্যে স্বামির চোখের পানে তাকাতেও হয়তো যে লজ্জায় সংকুচিত হ'য়ে প'ড়ত তাকে তিনি নরকে টেনে নিয়ে এসে তাকে দিয়ে সেই নারকীয় তাণ্ডব-উৎসব করিয়েছেন! তার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নিরন্ধ্র অন্ধকার ভরা ঘরের মধ্যে শুয়ে আশুবাবু দেখতে লাগলেন সংসারের পথ বেয়ে সবাই চলেছে হাসিমুখে। পিনাক, প্রতিমা, আরও কতো সব, সঙ্গে সঙ্গে, তাদের পেছনে তিনিও চলেছেন। তারা হাসছে, কথা বলছে কিন্তু

তার যেন বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়েছে, ইচ্ছা থাকলেও কারো সঙ্গেই তিনি কথা ব'লতে পারছেন না।

ক্রমে পথ কঙ্করময় হ'ল, তবুও তারা চলেছে কিন্তু তার দুটি পা তখন অবশ. চলতে গিয়ে পড়ে গেলেন। অন্ধকার হ'য়ে এসেছে তখন। সেই ম্লান আলো আর অন্ধকারের মধ্যে ধুলাকাদা মেখে ব'সে দেখতে লাগলেন তিনি অসংখ্য পথিকের চলাচল। তারা চলেছে আলোর দেশে।......

সম্মুখেই সুউচ্চ পাহাড়। প্রতিমা চলেছে সেই পাহাড় বেয়ে, ক্রমে সে সমতল ভূমিতে নেমে এল। পায়ের নীচে তার সুস্নিগ্ধ তৃণরাজি। তারপরই বিরাট সমুদ্র ফেনান্বিত উর্ম্মিমালা বুকে গর্জ্জন ক'রছে। তীরে তার একখানি মাত্র নৌকা। প্রতিমা নৌকার দাঁড় ধ'রে দাঁড়িয়ে তাকে যেন কি ইঙ্গিত ক'রল কিন্তু তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা অদৃশ্য হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কল্লোলিত সিন্ধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ছুটে আসতে লাগল সেই উপত্যকা ও পাহাড় অতিক্রম ক'রে !

ভয়ে আতঙ্কে আশুবাবু আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন : প্রতিমা ! প্রতিমা ! সঙ্গে সঙ্গে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখলেন, সমস্ত দেহ হ'তে ঘাম ঝ'রছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত আশুবাবু রাস্তায় ছুটে নামতেই কার সঙ্গে যেন তার ধাক্কা লাগল !

চোখে দেখতে পাননা মশাই ?

ছুটতে ছুটতেই আশুবাবু নম্রস্বরে ব'ললেন : আজ্ঞে প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে......

অবশিষ্ট কথা তার ভদ্রলোকের কানে প্রবেশ ক'রল না।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটতে ছুটতে সহসা আশুবাবুর গতি রোধ হ'ল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জন সমাগম। বালক বালিকা, যুবক যুবতী এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধাও এসে দাঁড়িয়েছে লাঠিতে ভর ক'রে ...।

আশুবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল নূতন এক জগৎ, নূতন তার রূপ। সে শুধু প্রেমের রাজ্য, কর্ত্তব্যের সংসার। এতোদিনের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবার সুযোগ পেয়ে আশুবাবু যেন কৃতার্থ হলেন। কিন্তু কেমন ক'রে কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারলে না, পেছন হ'তে সবেগে একখানি লাঠি এসে তার মাথায় প'ড়ল। রক্ত পর্দ্দার আড়াল হ'তে নয়নের স্তিমিতপ্রায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, যে যে-দিকে পথ পাচ্ছে সে দিকেই পালাচ্ছে। কোন মতে টলতে টলতে পার্কের বাইরে এসে ফুটপাথের উপরই তিনি শুয়ে পড়লেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে আশুবাবুর যখন চৈতন্য হ'ল তখন রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল কিন্তু কি কথা মনে হ'তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ধীরে ধীরে চ'লতে আরম্ভ ক'রলেন।

কোথায় চলেছেন, কেন চলেছেন কিছুই খেয়াল নাই, সোজা পথ ধরে শুধু তিনি এগিয়েই চ'ললেন।

হটাৎ তার গতিরোধ হ'ল। সামনের বাড়ীর অন্ধকার জানলার কাছে বসে কে ?—প্রতিমা না ? হয়তো তার জন্য অপেক্ষা ক'রছে !

হু হু শব্দে একটা হাওয়া বয়ে' গেল আশুবাবুর শ্রান্তিক্ষীণ মস্তিষ্কে খানিকটা শান্তি দিয়ে। হাওয়ায় জানলার পর্দ্দাটা সরে যেতেই আশুবাবু তার ভ্রম বুঝতে পারলেন। ওঃ, প্রতিমা নয় ও !

আবার চলা সুরু হ'ল। অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পাহারাওলা। আশুবাবু কি যেন ভেবে থমকে দাঁড়ালেন। কিছু সময় না যেতেই পাশের দরজাটা খুলে গেল, সে শব্দে চমকে উঠে আশুবাবু ফিরে

তাকালেন। কিন্তু চোখে যা দেখলেন তা যেন সত্য ব'লে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আশুবাবুকে হতভম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতিমা ব'লল: তোমায় দিনে আসতে লিখেছিলাম কিন্তু রাত্রে এলে! রাত্রে আমাদের এখানে কোন পুরুষের থাকার নিয়ম নাই।

প্রতিমা তা'র কথা শেষ না ক'রেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল: একি, তোমার মুখে, মাথায় রক্ত যে! আমার এই শেষ সর্ব্বনাশ ক'রতে কোথায় গিয়েছিলে ওগো! ব'লতে ব'লতে এগিয়ে এসে সে আশুবাবুর হাত ধ'রল।

তার স্পর্শে আশুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরে এল। প্রতিমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভগ্ন কণ্ঠে আশুবাবু ব'ললেন: না না আমায় ছেড়ে দাও প্রতিমা, তোমাকে স্পর্শ ক'রবার মত সময় আমার এখনও আসেনি। আমায় যেতে দাও।

ব্যগ্র স্বরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা ক'রল: কোথায় যাবে?

কোথায় যাব তা জানিনা তবে যাবই।

ক্ষণপরে আশুবাবু আবার ব'লতে লাগলেন: জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার উপর অবিচার অত্যাচার যথেষ্ট ক'রেছি। তার শাস্তি সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে।

তেমনি আর্ত্তকণ্ঠেই প্রতিমা ব'লে উঠল: এতকাল যা ক'রেছ, ক'রেছ; কিন্তু এখন এমনি ভাবে যদি তুমি চলে যাও তবে জেনো এ হবে আমার উপর তোমার চরম অত্যাচার। এমনি ক'রে পথের মানুষকেও যে পারেনা কেউ বিদায় ক'রতে।

ব'লতে ব'লতে প্রতিমা আশুবাবুর দুটি হাত জড়িয়ে ধরল। ম্লান উদাস কণ্ঠে আশুবাবু ব'ললেন: পথের লোক মানুষের সর্ব্বনাশ করেনা, কিন্তু আমি যে ......, ক্লান্তিতে তার অবশিষ্ট কথা জড়িয়ে এলো, ধীরে ধীরে তিনি রকের উপরই বসে প'ড়তে বাধ্য হ'লেন।

প্রতিমা যখন তার দুটী বাহুতে আঁকড়ে ধ'রে আশুবাবুকে নিয়ে উপরে এল তখন সকলেই ঘুমের ঘোরে। আশুবাবুকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যখন সে তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল তখন আশুবাবু ব'ললেন: প্রতিমা! ডালিমের সেবাও তো পেয়েছি কিন্তু এতো মধুর তো নয়! অনেক কথাই প্রতিমার বলার ছিল কিন্তু সে শুধু ব'লল: আমি যে প্রতিমা!

প্রতিমার দুটী হাত ধরে মিনতি ভরা কণ্ঠে আশুবাবু আবার ব'ললেন: চল প্রতিমা! আমরা দূরে কোথাও চ'লে যাই, যেখানে বন্ধু বান্ধব কেউ নাই,—যাবে?

প্রতিমা ব'লল: এখন তুমি চুপ কর। সুধা দাকে কাল জিজ্ঞাসা ক'রে ব'লব।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন: সুধাদা কে?

তোমাদের সেই পিনাক বাবু।

প্রতিমার কথায় আশুবাবু আর কোন কথা না ব'লে নীরবে কি যেন চিন্তা ক'রতে লাগলেন।

পরদিন...সবে মাত্র ছটা বেজেছে; দ্বারের উপর ঘন ঘন আঘাতের শব্দে প্রতিমা জেগে উঠে দরজা খুলে দিয়েই একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। পাশের অফিস ঘরে এসে প্রতিমা দে'খল সে ঘরে তখন সার্চ্চ চ'লছে। চারিদিকে রাশি রাশি বই কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি।

সে ঘরে ঢু'কতেই পুলিশ অফিসারটী ব'ললেন: চলুন, ও ঘরটাও তা' হ'লে দেখা যাক্।

রেবা ব'লল: চলুন, কি আর দে'খবেন, বিছানা বালিশ ভিন্ন কিছুই নাই।

পুলিশ দেখেই প্রতিমার হৃদকম্প আরম্ভ হ'য়েছিল। মুহূর্ত্তেই মনে হ'ল আশুবাবুর কথা, তার মাথার ক্ষত। এখন পুলিশ অফিসার এবং রেবার কথা শুনে তার অন্তরের যে অবস্থা হ'ল তা' অবর্ণনীয়।

কাল রাত্রে যাকে সে ঘরে এনে আশ্রয় দিয়েছে সে যে তার স্বামী এ কথা কে বিশ্বাস ক'রবে! এমন কি রেবা বা ডলিও যে এ সম্বন্ধে কিছুই জানেনা! পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তারাই বা কি জবাব দেবে? অথচ সমস্ত ঘটনা রেবাকে বলার সময়ও এখন নাই! উঃ ভগবান! ভগবান ভিন্ন এমন বিপদে কে তাকে রক্ষা ক'রতে পারে! মনে হ'ল সুধার কথা কিন্তু তার এ সময়ে এখানে আসা; না না, প্রতিমা তা চায়না, তার ফলে তার নিজের অদৃষ্টে যা হয় হ'ক।

সকলে যখন তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রল প্রতিমা তখন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আসামী যেমন ক'রে চরম রায় শুনবার জন্য বিচারকের মুখের পানে তাকিয়ে প্রতিটী মুহূর্ত্ত গণনা করে, ভগবানকে ডাকতে চাইলেও পারেনা মন স্থির ক'রে তাঁর নাম স্মরণ ক'রতে, প্রতিমা ঠিক তেমি ভাবে বাইরে অপেক্ষা ক'রতে লা'গল আর ব'লতে লাগল: ভগবান! রক্ষা কর। ভগবান! রক্ষা কর।

ঘরের মধ্যে ভূত দে'খলেও রেবা ও ডলি হয়তো এতোটা বিস্মিত হ'তনা যতোটা বিস্মিত হ'ল তারা আশুবাবুকে দেখে।

পুলিশ অফিসারটীর প্রশ্নের পরও তারা নীরব রইল। অফিসারটী আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন: কে ইনি?

আর অপেক্ষা করা চলেনা। পুলিশ অফিসারটীর কথায় প্রতিমা কোন মতে ব'লতে পা'রল: আমার স্বামী!

রেবা ও ডলির মনে হ'ল যেন তারা স্বপ্ন দে'খছে, যা শুনল সেটা ভুল।

আশুবাবুর নাম লিখে নিয়ে অফিসারটী বিদায় হ'ল। বিশেষ কোন হাঙ্গামাই সে ক'রল না।

কিছু সময় পরে রেবা এসে প্রতিমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ব'লল : আমরা তোমাকে ভাল ব'লেই জানতাম প্রতিমা কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস তুমি রাখলে না।

প্রতিমা প্রতিবাদ ক'রতে চেষ্টা ক'রল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথাই বেরোল না।

রেবা ব'লতে লাগল : তোমার অতীত জীবন থেকেই আমাদের এটা বোঝা উচিৎ ছিল কিন্তু এই সব ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে মিশেও যে তোমার পরিবর্ত্তন হ'লনা, এটা বড়ই দুঃখের।

উঃ ! একটা ক্ষীণ অস্ফুট ধ্বনি ক'রে প্রতিমা মাটিতে বসে প'ড়ল। প্রতিমার মনে হ'ল রেবা যেন হৃদয়হীন হিংস্র কসাই। তার অন্তরে মায়া মমতা দূরের কথা, করুণা এমন কি লজ্জাও এক কনা নাই।

নির্ম্মম কঠিন স্বরে রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল : কে ও ?—ওর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

চোখের জলে প্রতিমা উত্তর ক'রল : ওগো ! বিশ্বাস কর। ও-ই আমার স্বামী, ও-ই ডালিমের যথা সর্ব্বস্ব। ওঁকে ভিন্ন এ জীবনে আর কাউকে আমি স্পর্শ করিনি।

-কে তোমার এ কথা বিশ্বাস ক'রবে ?

প্রতিমা ব'লল : বিশ্ব শুদ্ধ সকলে অবিশ্বাস ক'রলেও এ সংসারে অন্ততঃ একজন আছেন যে প্রতিমার এমন কি ডালিমের এ কথা অবিশ্বাস ক'রবেন না।

পাশের ঘরে বসে আশুবাবু সমস্তই শুনছিলেন আর নিজের কীর্ত্তির কথা স্মরণ ক'রে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন।

পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জা অপমানের আর কি হ'তে পারে ! আর নারীর পক্ষেও এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক অপমান সংসারে আর কি আছে !—

প্রতিমা, তার বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর কর্ম্মদোসে সহ্য ক'রছে এই লাঞ্ছনা…তাও, এক নারীরই কাছে আর তা' তারই চোখের উপর!

সকলের অন্তরে যখন এমনি ঝড়ের তাণ্ডব তখন সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল সুধা।

তার সাড়া পেয়ে প্রতিমার অবরুদ্ধ চোখের ধারা আর মানা মানল না; দুটী চোখ ছাপিয়ে বেরোল সে ধারায় ধারায়।

সমস্ত শুনে সুধা রেবাকে ব'লল: প্রতিমা মিছে বলেনি রেবা। আশুবাবুর যদি পরিবর্ত্তন না হ'ত, আজ যদি এ ঘটনা না ঘটত তবুও আমি তার সে কথা বিশ্বাস ক'রতাম। যদিও প্রতিমা পরিষ্কার ক'রে এ কথা আমায় বলেনি,—তবুও আমি জানতাম।

সুধার কথায় রেবা প্রতিমার কাছে এসে ব'লল: প্রতিমা! আমি তো কিছুই জানতাম না ভাই, আমায় তুই ক্ষমা কর।

প্রতিমা কোন কথা ব'লতে পারল না, দু' হাতে রেবাকে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সমস্ত কথা ব'লে রেবা সুধাকে ব'লল: তোমার জন্যই এই 'সার্চ্চ'; তুমি আর ক'লকাতায় থাকতে পারবে না। আজই তোমায় চ'লে যেতে হবে।

হেসে সুধা ব'লল: কিন্তু যাব কোথায়? কাজ আমার এখানে আর আমি যাব কোন্ চুলোয়?

হেসে রেবা ব'লল: চুলোয় কেন?—লীলার কি দোষ হ'ল?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে সুধা কাগজ পত্র দে'খতে লাগল।

অফিসের কাজ দেখে শুনে সুধা যখন সুলেখাদের বাড়ীতে এল তখন সুলেখা তার ছোট্ট 'বেবি অস্টিন'টা নিয়ে গলদ ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে।

কিছুদিন ধ'রে এই হ'য়েছে তার নতুন এক নেশা; 'ড্রাইভিংগ' তাকে শিখতেই হবে।

সুধাকে দেখেই সুলেখা নেমে এসে তার হাত ধ'রল : আমায় 'ড্রাইভিংগ'টা শিখিয়ে দাও। সুলেখার কথা শুনে, তার হাবভাব দেখে সুধা বিস্মিত হ'ল।

এ কি অদ্ভুৎ খেয়াল? 'ড্রাইভিংগ' শিখে কি ক'রবে?

কি আর ক'রব?—এমনিই!

ব'লে সে সুধার হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে তাকে টেনে নিয়ে এল গাড়ীর কাছে। বাধ্য হ'য়েই সুধা গাড়ীতে উঠে বসল কিন্তু তার মনে হ'ল যেন সুলেখার 'ডাইভিংগ' শেখাটা একটা অভিনয় মাত্র।

সুলেখা শুধু অবিশ্রাম বকেই চলেছে।

সুধা কোন কথা না ব'লে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল সুলেখার চোখের পানে। তার সে দৃষ্টিতে সুলেখার এতো উল্লাস মুহূর্ত্তে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল।

এ আমার ভাল লাগছেনা। আজ থাক।

ব'লে সুলেখা গাড়ী থেকে নেমে সোজাসুজি উপরে উঠে গেল। তার এই অদ্ভুৎ ব্যবহারে সুধা একটু হাসল মাত্র।

রেবা এমন কি নীলিমার ব্যাবহারেরও একটা সঙ্গতি পাওয়া যায় কিন্তু সুলেখার এই অর্থহীন আচরণের কোন কারণই সুধা ধ'রতে পারে না।

এ সম্বন্ধে সে অনেক চিন্তা ক'রেছে। কখনও কখনও মনে হয়, হয়তো এ সব সুলেখার অত্যন্ত সরলতা আর তার নিজের গভীর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির আত্মঘাতী একটা সংশয় মাত্র!

যা হ'ক্ আজ সে এর একটা মিমাংসা ক'রবে স্থির ক'রে উপরে আসতেই

সুলেখার কণ্ঠস্বর তার কানে এল : কইরে ! আমার 'ওডিকোলানে'র শিশিটা দিয়ে যা, আর পাখাটা খুলে দে।

সুধা ঘরে ঢুকে সুলেখার কপালে হাত রেখে ব'লল : কি, মাথা ধ'রেছে ?

সুলেখা নিরুত্তর।

আমি এলাম একটু গল্প ক'রব ব'লে আর·· ···

সুধার কথা শেষ না হ'তেই সুলেখা উঠে ব'সে ব'লল : সত্যি ?

—কিন্তু তোমার যে মাথা ধ'রেছে ! ব'লতে ব'লতে সহসা সুধা উঠে গিয়ে বড় ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে তার 'পেণ্ডুলাম'টা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগল, তারপর ঘড়িটাকে দিল বন্ধ ক'রে।

না, তেমন কিছু না, সামান্য একটু ধরেছিল ; তা' এক্ষুনি সেরে যাবে।

অনুমানেই সুধা বুঝল এতোক্ষণে সুলেখা তার বেশ বিন্যস্ত ক'রেছে। ওকি ! আবার ঘড়িটার মাথা খাচ্ছ কেন ?

তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই সুধা উত্তর ক'রল : আমি এলাম তোমার সঙ্গে গল্প ক'রতে আর এ হতভাগা প্রতিটীক্ষণ শুধু খোঁচা দিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেবে এই একঘণ্টা হ'ল, এই দু' ঘণ্টা হ'ল।

মনে মনে খুসী হ'লেও সুলেখা ব'লল : আমি কি রেবা যে ও কথা বলছ ?

সুধা ঘুরে দাঁড়িয়ে ব'লল : তার মানে ? তোমার চেয়ে রেবাকে বেশী ভালবাসি···এই তো ? কিন্তু এতোকাল ধ'রে আমি ব'লে আসছিনা যে এটা তোমার মনের একটা ভুল ধারণা মাত্র ?

আমার ভুল ধারণা ? সুলেখা ব'লল : তোমাদের আলাপ ব্যবহার যে লক্ষ্য ক'রবে সে-ই আমার মত ভুল ক'রবে।

সুধা ব'লল : সকলেই ক'রবে না। তোমার মনে হবার অর্থ কি জানো ? প্রতি মুহূর্ত্ত তুমি ঐ কথা চিন্তা কর তাই আমাদের প্রত্যেক কথাতেও তুমি সেই আভাসই পাও।

মনে তো আমি অনেক কিছুই করি কিন্তু, না না, তাকি হয় কখনও !

সুলেখার কথায় সুধা মনে মনেই হাসল। ক্ষণপরে ব'লল : আচ্ছা লেখা ! তোমাকে একটা কথা বলছি, সরল ভাবে সত্যি উত্তর দিও।

সুলেখা বলল : বেশ ! বল !

সুধা ব'লতে লাগল : শোন, এক খুনের অপরাধে তোমাকে 'য়্যারেষ্ট' করা হল।

বাঃ ! এ কি কাব্য নাকি ? কিন্তু এ বীভৎস রস কেন ?

সুলেখার কথায় বাধা দিয়ে সুধা ব'লে চ'লল : শোন, কোথায়ো কিছু নাই, হটাৎ পুলিস এসে তোমাকে 'য়্যারেষ্ট' ক'রে নিয়ে গেল। সেদিন সংবাদ পত্রে, লোকের মুখে মুখে, চারিদিকে ছড়িয়ে গেল সুলেখা খুন ক'রে ধরা পড়েছে। পুলিশের কাছে তুমি জিজ্ঞাসা ক'রলে যে কি জন্য তোমাকে 'য়্যারেষ্ট' করা হ'ল। পুলিশ ব'লল, তুমি খুন করেছ। তুমি হাজতে গেলে।

সকলের মুখেই এই হত্যার কথা, তোমার বন্ধু মহলেও এ নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। সকলেই ব'লছে, সুলেখা খুন ক'রেছে।

যারা তোমার সঙ্গে হাজতে দেখা ক'রতে যায় তাদের কাছে তুমি তোমার নির্দ্দোষীতার কথা ব'লে ব'লছ যে এ কথা সত্য নয়, এটা একটা সাজান ঘটনা। এ যে কখনও উকিলের জেরার মুখে দাঁড়াতে পারেনা এ বিশ্বাস তোমার আছে।

যারা তোমাকে জানে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা মেনে নিল আবার কেউ কেউ ব'লল ; তা কি হয়। পুলিস কি অমনিই ধরেছে !

হাজত ঘরে বসে তুমিও ভাবছ পুলিশ এ ভুল কেন ক'রল, কেমন ক'রে ক'রতে পারল ! পরে তোমার বিচারের দিন এল। কাতারে কাতারে দর্শক এসেছে এই খুনের বিচার দেখতে। তোমার পক্ষে বিচক্ষণ উকিল দেওয়া হ'ল। দিনের আলোর মত সত্য—যেমন তুমি তোমাকে নির্দ্দোষী জান,

যেমন ক'রে তুমি এই মিথ্যার জাল ভেদ ক'রে নিজের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ ক'রতে পার, ঠিক তেমনি ক'রেই তোমার উকিল তোমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন কিন্তু প্রতিপক্ষ এমন যুক্তি এবং অকাট্য প্রমাণ দেখাল যে তাতে সকলেরই বিশ্বাস হ'ল যে এই হত্যা তুমিই করেছ। বিচারক তোমাকে কয়েক বৎসরের জন্য নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

অতর্কিতে সুলেকার কণ্ঠ হ'তে বেরিয়ে এল : সে কি !

তার সে-কথায় খেয়াল না ক'রে সুধা ব'লে চ'লল : সেই অন্ধকার কক্ষের মধ্যে ব'সে প্রতিমুহূর্ত্ত তুমি ভাবছ সংসারের অনিয়ম অবিচারের কথা। ভেবে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলে যে কেমন ক'রে সাক্ষীর পর সাক্ষী এসে ব'লে গেল যে সেদিন রাত্রে রাস্তার মোড়ে তারা দেখেছে তোমাকে হত্যা ক'রতে; তারা যখন এসে প'ড়ল তখনও তোমার হাতে সেই রক্তমাখা ছোরা আর পায়ের নিচে প'ড়ে সেই সদ্য মৃত দেহ, রাস্তায় ব'য়ে যাচ্ছে রক্তের স্রোত।

ভাবতে ভাবতে তোমার এমন অবস্থা হ'ল যে প্রতিক্ষণ তুমি চোখের সামনে দেখতে আরম্ভ ক'রলে সেই বিভীষিকার ছবি। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে তোমার দশটি বৎসর কাটল। এমনি সময় কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা সুলেখা! কে খুন করেছে, বল দেখি ?'……

নির্নিমেস দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সুধার মুখের পানে চেয়ে থেকে সুলেখা মাথা নিচু ক'রল।

সুলেখা যখন সুধার মুখের পানে চেয়ে ছিল তখন সে লক্ষ্য ক'রল সুলেখার দৃষ্টি অন্ধের মত নিষ্প্রভ, মুখখানি ম্লান বেদনাতুর। বহুক্ষণ ধরে উভয়ে নীরব হ'য়ে রইল। সুলেখার আনত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে সুধা আবার ব'লল : পুরোণ কথা যদিও তবে এ যে সত্যি ; আমি তা বুঝেছি। সর্ব্বদার জন্য মনে রাখা উচিৎ যে আমি মানুষ ; প্রবৃত্তি আমার দাস; সে আমার অধীন।

কোনও দিন কোন কারণে প্রবৃত্তি যদি বিবেকের উপর তার আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারে তবে বুঝবে যে তখন তোমার সমুখে ভয়ানক একটা কিছু অপেক্ষা ক'রছে . ফাদার 'ওথ' প্রায়ই একথাটা ব'লতেন।

ফাদার 'ওথ'! কোন ফাদার 'ওথ'?

সুলেখার প্রশ্নে সুধা ব'লল: তুমি যাঁকে মনে ক'রেছ তিনিই।

আপনি তাঁকে কি ক'রে চিনলেন?

তোমাকে তিনি কি ক'রে চিনলেন, তা জানো কি?

সুধার এ-কথায় সুলেখার মনে এল আজ অনেক কথা, অনেক ইতিহাস।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে ব'লল: অনেক দিন ভেবেছি আপনাকে সব বলব—আমার দুর্ভাগ্যের কথা কিন্তু ব'লতে পারিনি। আপনি ও তো 'ওয়ারে' গিয়েছিলেন, হয়তো আপনি তাকে চিনলেও চিনতে পারেন।

ব'লতে ব'লতে, এতোদিন পরে কখনও না-দেখা ভাইয়ের শোকে তার দু' চোখ ছাপিয়ে জল এলো।

সুলেখার মাথার উপর একখানি হাত রেখে দরদভরা কণ্ঠে সুধা ব'লল: কিন্তু তাকে দেখলে কি তুমি চিনতে পারবে লেখা? তুমি তো কখনও তাকে দেখনি।

তার সে স্নেহ-স্পর্শে সুলেখার চোখের ধারা আর মানা মানলনা, বলল: আমি না চিনি, বেঁচে থাকলে, ফিরে এলে তিনি কি আমায় চিনতেননা আমার খোঁজ নিতেন না? নাই, নাই. এ সংসারে আমার কেউ নাই। একটা দিক্ আমার একেবারেই অন্ধকার। ব'লতে ব'লতে সে একেবারে কেঁদে, ফে'লল। সুধার চোখেও তখন জল। গভীর স্নেহে সুলেখার একখানি হাত ধ'রে সে ব'লল: সুলেখা বোন, তোর পাষান ভাই সবই পারে। কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি দিদি, তুই আমায় ক্ষমা কর।

সুধার কথার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা ধ্বনি ক'রে সুলেখা সুধার কোলের

ভিতরে মাথা রা'খল।

বহু সময় ধরে বিজন এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মত। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিলনা। এও কি সম্ভব? সুলেখা, তার স্ত্রী, আর সুধা, তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুধা; যার সঙ্গে একদিন নয় দুদিন নয়—দিনের পর দিন রাতের পর রাত; কতো কাল ধ'রে নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছে ক্রমে নিবিড়তম···সংসারের কতোনা ঘাত প্রতিঘাত, কতো বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে. কেমন ক'রে সে বিশ্বাস ক'রবে যে সে বিশ্বাসঘাতক!—অথচ এই ঘটনা, এরই বা কি অর্থ হ'তে পারে? প্রত্যক্ষ সত্য যে ঘটনা তাকে অলীক কল্পনা বা স্বপ্ন বলে কি ক'রে সে উপেক্ষা ক'রবে? কিন্তু হায়! যদি তা' সম্ভব হ'ত? যা সে দেখেছে, সত্য না হ'য়ে পারেনা কি এ দুঃস্বপ্ন হ'তে?···

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজন শতাব্দীর চিন্তা ক'রে ফেলল। ক্রমে তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে এ সমস্তের মূল কারণ একমাত্র সুলেখা। ভাবতে লা'গল সে···এই কি তবে নারীর সত্য রূপ?···

যতোই সে চিন্তা ক'রতে লাগল ততই নারী জাতির প্রতি গভীর একটা অশ্রদ্ধায় তার অন্তর ভরে উঠল। ক্রমে সে হ'য়ে উঠল অধীর অস্থির।

কিছু সময় পরে ভয়ানক একটা পরিনামের সংকল্প করে যখন সে ঘরে প্রবেশ ক'রল তখন সুধা বেরিয়ে গিয়েছে। বিজনকে দেখেই সুলেখা কি একটা কথা ব'লতে গেল কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে বিজন ব'লল: থাক্, না ব'ললেও চলবে।

কি হয়েছে······না বলতেই তুমি তা' বুঝতে পারলে?

সুলেখার এই নির্লজ্জতায় বিজন অবাক হ'য়ে গেল। তীব্র স্বরে সে ব'লল: লজ্জা ক'রলনা তোমার একথা ব'লতে! ছি!

মুহূর্ত্তেই সুলেখার মুখ হ'য়ে গেল অন্ধকার নিরেট পাথর। বিজনের এই

কথার কারণ বুঝতে তার বিলম্ব হ'লনা কিন্তু সে তার কোন প্রতিবাদ না ক'রে নিঃশব্দে পাশের ঘরে এসে শুয়ে প'ড়ল। এতো আনন্দের পরেই এই নিদারুণ আঘাত তার সহ্য হ'লনা। হু হু করে তার চোখে জল এলো। বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রে উঠল ব্যথার সমুদ্র।

এতো অবিশ্বাস! আর এতোদিনের বন্ধুত্বর মূল্যও কি এই?

একবার মনে ভাবল সে সমস্ত কথা খুলে বিজনকে বলে কিন্তু পরক্ষনেই তার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হ'ল।

কেন? কেন সে অমনি ক'রে যেচে তার বিশ্বাস ভালবাসা ভিক্ষা ক'রতে যাবে? সে তার স্ত্রী, তার উপর তার স্বামী যদি এতোটুকু বিশ্বাস, এতোটুকু নির্ভর ক'রতে না পারেন তবে সেই বা কেন তার নিজের পত্নীত্বের সম্মান বলি দিতে যাবে। এই কি স্বামীর ভালবাসা, তার প্রেমের নিদর্শন! জন্ম সঙ্গে হারান তার ভাই, আর যে এমন ভাই; যার বন্ধুত্বে বিজন নিজেই গর্ব্বিত;—এতোদিন যে তার কাছে মৃত ব'লেই ছিল—এই দীর্ঘদিন পরে তাকে, তার একমাত্র বান্ধব; তার মায়ের পেটের ভাইকে ফিরে পেয়ে সেই শুভ সংবাদ স্বামীকে জানাতে গিয়ে পেল সে তার এই অবিশ্বাস, অপমান!

স্বামী যদি তার সুখের কথাটা শুনে নিয়ে তাকে আঘাত ক'রতেন তাতে সুলেখার হয়তো আজ এতো দুঃখ হ'তনা। স্বামী তাকে অবিশ্বাসিনী মনে করেছেন এ দুঃখ রাখবার আজ তার ঠাঁই নাই।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে মনে সে কতো সংকল্পই না স্থির করে ফেলেছিল। সে ভেবেছিল কালই সে তার সমস্ত বন্ধু বান্ধবী যে যেখানে আছে সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রবে। সকলের নিকট সে উঁচু মুখ ক'রে ব'লবে যে সুধা তার ভাই সে তার বোন,—দূর সম্পর্কের নয়, বৈমাত্র নয়, তার সহোদর।

মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে, সুলেখা ভাবছিল তার মত সুখী আজ কে? অমন মহাদেবের মত স্বামী, ইন্দ্রের মত ভাই ক'জনের অদৃষ্টে হয়। কিন্তু সেই

মহাদেব স্বামী এ কী হলাহল উদ্‌গীরণ ক'রল! এ যে তার বিশ্বাসের; তার কল্পনারও বাইরে! স্বামীকে সে কোনও দিনই তো এরূপ ধারণা ক'রতে পারেনি। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসের দাবী কি শুধু স্বামীরই আছে?—স্ত্রীর কি অন্তর ব'লে কিছু থাকতে পারে না? বিশ্বাস কি আজ শুধু সুলেখাই ভেঙেছে? বিজনের উপর সুলেখার যে অটল বিশ্বাস ছিল, যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এই হীনতার পরিচয় কি তাকে একটুও ক্ষুন্ন করেনি?

এমন সুগভীরই কি স্ত্রীদের প্রেম? তেমনই কি স্বামী আশা করেন? কিন্তু কোন্ অধিকারে, কিসের বিনিময়ে? একি জুলুম নয়, অন্যায় দাবী নয়? যেখানে এতো অবিশ্বাস, এতো অনাস্থা সেখানে দাবী তো তার কিছুই থাকতে পারে না।

কতো কিই না সে ভাবতে লাগল।

অনেক রাত্রে ঠাকুর এসে টেবিলের উপর খাবার রেখে ব'লল: অনেক রাত হ'য়েছে মা! খাবেন, উঠুন।

না উঠেই সুলেখা জিজ্ঞাসা ক'রল: বাবুদের খাওয়া হ'য়েছে?

ঠাকুর উত্তরে ব'লল যে বাবু দুখানা লুচি মাত্র মুখে দিয়েছেন।

—আর সুধাবাবু?

সুধাবাবু কোথায় যেন বেরিয়েছেন; এখনও ফেরেননি।

ঠাকুর চলে গেল। সুলেখা ভাবতে লাগল সুধা এতোরাত্রে কোথায় গেল? কেন? বিজনের কথা কি সে শুনতে পেয়েছে? হয়তো তাই, যদি তাই হয় তবে···

সুলেখা ভেবে কিছু বুঝতে পারে না।

সুধা যদি চ'লে যাবার উদ্দেশেই বেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে নিশ্চয়ই ব'লে যেতো। সে ফিরবে, নিশ্চয় ফিরবে মনে ক'রে সুলেখা তেমনি ভাবে বসে আকাশ পাতাল চিন্তা ক'রতে লাগল।

স্বামীর অবিশ্বাস, তার বাক্য জালা সমস্ত ভুলে গিয়ে বিনিদ্র নয়নে শুধু সে ভাবতে লাগল, সুধা তার ভাই, তার সহোদর…যাদের এক মা একই পিতা; যার চেয়ে আপনার সংসারে কেউ হ'তে পারে না,…সুধা, রেবাদের সেই সুধারায় তারই ভাই!

সময় কারো মুখ তাকায়না, সে চলেছেই চলেছে। আর তার সাক্ষী দিচ্ছে হৃদয়হীন বড় ঐ ঘড়িটা।

ঢং ঢং ক'রে চারটা বাজল, তখনও সুধা ফিরল না দেখে সুলেখা উতলা হ'য়ে উঠল। কিন্তু কি ক'রবে সে! কোথায় সংবাদ নেবে, কেমন ক'রে নেবে? ভারাক্রান্ত মনে একবার এ ঘর একবার সে ঘর ক'রে ক'রে এক সময় সে শ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

আচমকা সুলেখার ঘুম ভেঙে যেতেই কানে এলো কে যেন নিচে সুধার নাম ধ'রে ডাকছে। ছুটে গিয়ে রেলিঙের কাছে দাঁড়াতেই সে দে'খল ছুটতে ছুটতে ডলি উপরে আসছে।

ডলির ম্লান অশ্রু সজল দৃষ্টি, কম্পিত হস্ত পদ দেখে সুলেখা ভয়ানক একটা কিছুই আশঙ্কা ক'রছিল কিন্তু যখন সে সত্য সংবাদটা জানতে পারল তখন তার অন্তরাত্মা প্রাণপনে ব'লতে চাইল: এ আমি শুনতে চাইনি,চাইনি।

ডলি কোন মতে ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর এলিয়ে প'ড়ল। সুলেখা জিজ্ঞাসা ক'রল: অমন করছিস কেন ডল্? কি হ'য়েছে?

রে'দিকে 'য়্যারেষ্ট' ক'রে নিয়ে গেল।

এ্যাঁ…সে কি!

সুলেখার মনে হ'ল ডলি হয়তো তার সঙ্গে পরিহাস ক'রছে। তাই সে ব'লল: এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করিসনা ডল্। আর আমার মনের অবস্থাও ভাল নেই।

এ কি ঠাট্টা ক'রবার কথা সু'।

ব'লতে ব'লতে ডলির দুটো চোখ ছল ছলিয়ে এল। আর অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেবার শক্তি সুলেখার হ'লনা। একেই তার মানসিক অবস্থা পূর্ব্ব হ'তেই ভাল ছিল না এখন ডলির কথায় সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কেনই যেন মনে হ'ল তার এবার সুধার পালা।

ডলি ব'লল: আজ গিয়েই আমি হিরণীকে তাড়াব। লক্ষ্মীছাড়া ডাইনি, রাক্ষুসী…

সুলেখা জিজ্ঞাসা ক'রল: হিরণ কে?

ডলি ব'লল: এক হতভাগী, তার সংসারে কেউ নাই ব'লে এসে জুটে ছিল। 'সুপাই' ব'লে আমি প্রথম হ'তেই তাকে সন্দেহ করেছি কিন্তু ঐ রে'দিরই ওর জন্য একেবারে মায়া ধ'রতনা। ওকে আজ আমি ঝেঁটিয়ে দূর ক'রব; তারপর আমার অন্য কাজ। কিন্তু সুধা দা কোথায়?

সুলেখা বিপন্নের মত ডলির পানে তাকিয়ে উত্তর ক'রল: রাত্রে তো তিনি এখানে ছিলেন না। আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোদের ওখানেই আছেন?

তা' হ'লে উপায়?

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে ডলি জিজ্ঞাসা ক'রল: বিজন বাবু কোথায়?

জানিনা।

ডলি উঠে দাঁড়িয়ে ব'লল: আমি আর দেরী ক'রতে পারিনা সু'। বিজন বাবুকে একবার আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিও, আর ব'ল সুধাবাবুর খোঁজ ক'রতে। প্রথম আসামী রেবা নয় সুধা দাই।

ডলি বেরিয়ে গেল আর সুলেখা বসে রইল হতভম্বের মত। ডলি যে তাকে কতো বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের কথা ব'লে গেল তা' যেন সে শুনেও শুনতে পেলনা এমনি ভাবেই সে বসে রইল।

নিচে নেমে আসতেই বিজনের সঙ্গে ডলির দেখা হ'ল। সমস্ত শুনে বিজন ব'লল : বেশ চল, আমি যাচ্ছি।

বিজন ও ডলি নারীশিক্ষালয়ে এসে দে'খল সুধা সেখানে বসে আছে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে বীরেন ডাক্তার আশুবাবু ও প্রতিমা। সুধাকে দেখেই ডলি ব'লে উঠল : যা হবার হ'য়েছে কিন্তু আপনি আর এখানে বসে থাকবেন না। এখনও যে বাড়ীর সামনে পাহারা রয়েছে।

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুধা ইঙ্গিতে বিজন ও বীরেন ডাক্তারকে-পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল, এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ফিরে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল : হিরণ কোথায় প্রতিমা?

প্রতিমা ব'লল যে রেবাকে নিয়ে যাবার পর থেকে হিরণীকে আর দে'খতে পাওয়া যাচ্ছেনা।

সে আমি জানি; নিষেধও ক'রেছিলাম রেবাকে কিন্তু সে শুনল না। সংসারে সবাই যদি রেবা হ'ত তবে……

ব'লতে ব'লতে সে নীরব হ'ল। ডলি তার মুখের পানে তাকিয়ে দে'খল আষাঢ়ের রক্ত সন্ধ্যার মতই মুখখানি তার গম্ভীর বিষন্ন এবং ভয়াবহ।

সুধার এমন চেয়ারা এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একদিনও সে দেখেছে ব'লে মনে হয় না। বিজনের পানে তাকিয়ে সুধা ব'লল : তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল কিন্তু এ যাত্রায় আর হ'লনা।

ডলি! প্রতিমা! তোমরা বীরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কখনও কিছু ক'রনা। আর আশুবাবুকে বলার আমার কিছু নাই। সংসারের সবই তো একবার ক'রে দেখেছেন এবার কিছুদিন না হয় দুঃখটাই ভোগ ক'রে দেখুন। তবে প্রতিমার স্বামীত্বের সম্মান যেন আপনি রাখেন; এটুকু আমার মিনতি। তারপর কিছু সময় নীরব থেকে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই

সে বলল : এই রেবা ; আমি নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করতাম, শ্রদ্ধা করতাম।...

ধীরে ধীরে সুধা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে বিরাজ করছিল তখন বিরাট স্তব্ধতা! ডলির মনে জাগছিল তখন কত কথা, কত চিন্তা, কত ইতিহাস।

প্রথম যখন সে হোষ্টেলে আসে তখন এই রেবা প্রথম দর্শনেই তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধ'রে, তার চিবুক নেড়ে ব'লেছিল, বাঃ! বেশ মেয়েটী তো! তারপর অন্যান্য সকলের পানে চেয়ে ব'লল. এ যেন ঠিক পুতুলটী। রেবার সেই আদরে ডলির মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মনে মনে রেবাকে সে অত্যন্ত আপনার ব'লে গ্রহণ ক'রল। সেই দিন হতেই প্রচার হ'য়ে গেল তার ডলি নাম।

এমন একদিন ছিল যেদিন রেবার মুখের আদরের ঐ 'ডল' ডাকটী শোনার জন্য মনে মনে সে কামনা ক'রেছে। রেবা যদি তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট হেসে কথা বলেছে তবে মনে মনে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। শুধু সে কেন, সে দিন হোষ্টেল শুদ্ধ সমস্ত মেয়েরাই ঐ রেবার সঙ্গে একটুখানিক আলাপ করার জন্য, তার সঙ্গে বেড়াবার জন্য, খেলা করবার জন্য অন্তরে পোষণ ক'রত প্রবল একটা আগ্রহ। বড় ছোট যে যেখানে ছিল সকলকে সে চুম্বকের মত নিজের পাণে আকর্ষন ক'রত ব'লে সকলেই তাকে ব'লত 'চুম্বক'!

রে'দিকে নিয়ে, তার চলা ফেরা হাসি গান নিয়ে সকল রুমে রুমে মেয়েদের মধ্যে প্রতিক্ষণ যেমন আলোচনা চলত তেমনি তার এতটুকু করুণা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য এবং দলাদলি যে কতো হয়েছে তার হিসাব আজ ডলির মনে নাই। আর সেই মনোমালিন্য, সেই বিবাদ দূর ক'রতে পারত একা রেবাই, অন্য কারো সে শক্তি ছিলনা কিন্তু রেবার কানে যখনই একথা যেত তখনই সে এসে সকলকে নিয়ে এমন ভাবে হাস্য পরিহাস ক'রতে

আরম্ভ ক'রত যে উভয়পক্ষেরই ক্ষোভ যে কোথায় কি ভাবে মিলিয়ে যেত তা কেউ বুঝতে পারতনা।

সমস্ত হোষ্টেল তখন 'রেবা' 'রেবা' ক'রে চঞ্চল মুখর। সমস্ত মেয়েরাই রেবার মুখের একটি কথা, তার ইচ্ছার ইঙ্গিত মাত্র পালন করতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়। এতোখানি সৌভাগ্য, সম্মান খুব কম মেয়ের অদৃষ্টে ঘটে, রেবার কিন্তু সে জন্য কিছুমাত্র অহংকার ছিলনা।

মাঝে মাঝে সুপারিন্‌টেন্‌ডানট্‌ মিস শোভা হালদার ব'লতেন, আমার এখানে থাকবার দেখছি কোন আবশ্যক নাই। রেবাকেই আমার পোষ্ট দেওয়া উচিৎ ছিল।

মেয়েরা শুনে আড়ালেই হাসে, অভিমত প্রকাশ করে, মন্দ কি, সে আমাদের রাম রাজত্ব হবে।

ঘুরে ফিরে কথাটা গিয়ে ঠিক মত স্টেশনে পৌছয়। শুনে মিস্‌ হালদার নিজের মনে মনেই গর্জ্জে সারা হন।

ঠিক এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল যে কথাটা আজ বার বার ক'রে ডলির মনে হ'চ্ছিল।

সে দিন সকলে 'কমন রুমে' বসে। প্রায় পঁচিশটি মেয়ে রেবাকে ঘিরে বসে' গল্প শুনছে আর মাঝখানে বসে রেবা বলছে: কাল রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছি জানিস? স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি আর তোদের রে'দি নাই, একেবারে বদলে গিয়েছি।

সকলে প্রশ্ন ক'রল: তার মানে?

রেবা ব'লতে লাগল: মানে আমি আর রে'দি নাই একেবারে রে'দা হ'য়ে গিয়েছি।

সকলেই রেবার এই স্বপ্ন রহস্য বেশ উপভোগ ক'রল, প্রশ্ন হল, তারপর ?

তারপর আমার বিবাহ। সাধারণ বিবাহ মোটেই নয়; একবারে স্বয়ং-স্ত্রী সভার আয়োজন। দেশ দেশান্তর হ'তে কাতারে কাতারে মেয়ে ছুটে এল মালা হাতে। সভার মাঝখানেই আমি বসে আছি, আমার চারধারে বসে কত লোক, পুরুষ নারী দুইই।

সহসা আমার গলায় মালা প'ড়তে আরম্ভ হ'ল, একটী পর একটী, তারপর আর একটী। আমি আবাক অপ্রস্তুত। একি! মালার ফাঁসে কি আমি নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মারা যাব! আমি চিৎকার ক'রে ব'ললাম: তোমরা থামো, কে কে মালা দিলে আগে আমায় দেখতে দাও। আমার কথায় তারা থমকে দাঁড়াল। আমি প্রথমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কি ?

মুচকি হেসে সে উত্তর ক'রল: ঐ মালাতেই লেখা আছে।

তখন আমি একটী একটী ক'রে মালা তুলে দেখতে লাগলাম, দেখি অসংখ্য মালা। এতোগুলি মেয়ে আমার গলায় বর মাল্য দিল দেখে গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠল। পরক্ষণেই আবার অতগুলি স্ত্রীকে কেমন ক'রে বশে রাখব ভেবে বড়ই ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম। আর, কটিকে রাখি, আর কাকে কাকেই বা রাখি! তখন আবার নাম গুলি দেখতে আরম্ভ করলাম। হেনা জিজ্ঞাসা করল: তা' কি নাম দেখলে, আর কাকেই বা স্থির করলে ? রেবা বলল: দেখেছি অনেক কিন্তু স্থির কিছুই হয়নি।

অনেক মানে ? নামগুলি শুনি।

নাম গুলি আমি বলে যাচ্ছি; শোন।

রেবা ব'লতে আরম্ভ ক'রল: লীলা, নীলিমা, হেনা, নিভা, লেখা, পারুল, এমনি আরও কতো; সকলের শেষে এলো আমার ছোট্ট পুতুলটী 'ডল'।

রেবার কথার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল হাসি। সে হাসি যেন

আর শেষ হ'তে চায়না। হাসতে হাসতে রক্তাভ মুখে একজন যদি বা হাঁপিয়ে উঠে কোনমতে নিজেকে শান্ত করে কিন্তু অপরাপর সকলের হাসি ও ভঙ্গি দেখে আবার সে আরম্ভ করে হাসতে।

এমনি ক'রে যখন হাসির প্রতিযোগীতা চলছিল তখন সহসা সেখানে এসে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালেন মিস শোভা হালদার।

তাঁকে দেখে মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অবশিষ্ট সকলে কোনমতে নিজেদের সংযত ক'রে রাখল।

মিস্ হালদার গম্ভীর স্বরে বললেন: ডলি! আমার সঙ্গে এসো। হঠাৎ ডলিকে এমনি ভাবে অফিস রুমে ডেকে নেবার অর্থ বুঝতে না পেরে সকলেই পরস্পরের মুখ তাকাতে লাগল।

কিছু সময় পরেই ডলি ফিরে এলো ম্লান মুখে।

রেবা জিজ্ঞাসা ক'রল: কি রে ডল?

রেবার প্রশ্নের উত্তরে ডল ব'লল যে মিস্ হালদার ডলির ঘরে বায়রণের এবং আরও কার কার কতগুলি নিষিদ্ধ কবিতার বই পেয়েছেন তাই তাকে সাতদিনের মধ্যেই হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমন বই নাকি আরও অনেকের ঘরে পাওয়া গিয়েছে; সকলকেই হোষ্টেল ছাড়তে হবে।

এ কী অদ্ভূত কথা!

সকলকে থামিয়ে রেবা ব'লল: কাকেও হোষ্টেল ছাড়তে হবেনা দেখিস।

কোথা হ'তে কি হ'ল কেউ কিছু বুঝতে পারল না কিন্তু সকলেই দেখে বিস্মিত হ'ল যে মিস্ হালদার একদিন সহসা অন্তর্দ্ধান হ'লেন আর তার পরিবর্ত্তে এলেন পূর্ণিমা সেন।

বিশেষ কিছু না বুঝলেও এটা সকলেই বুঝল যে এসব রেবারই কাজ। শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সকলে তাকে আঁকড়ে ধরল আরও নিবিড় ভাবে। সেই

রেবা, তার রে'দি আজ এতোক্ষনে হাজতে। একথা চিন্তা ক'রতেও ডলির চোখে হু হু ক'রে জল আসে। সে কি ক'রবে বুঝতে পারেনা কিছু। বীরেনবাবু উকিলের কাছে গিয়েছেন জামিনের জন্য, এখনও ফিরে আসেননি। তার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে ডলি কতো কি চিন্তা ক'রছিল। তার পিতা তাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন; সেও হাসি মুখে তাঁদের পরিত্যাগ করেছে। এতদিনের মধ্যে একবারও তার জন্য তার অন্তরে ব্যথা এমন কি অনুশোচনা জাগেনি শুধু রেবার জন্য। রেবার উপর নির্ভর ক'রে বোধ হয় সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে ভয় ক'রত না কিন্তু আজ? আজ ডলির মনে হ'ল যেন সে অকুল সমুদ্রের মাঝখানে পড়েছে, কিন্তু কোথায় আজ তার কাণ্ডারী?

* * * *

বাংলোর বারান্দায় বসে ত্রিবিক্রমবাবু দূরের পানে তাকিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। দূরের অস্পষ্ট কাল পাহাড়ের পরপার থেকে ধীরে ধীরে চাঁদখানি পাহাড়ের শৃঙ্গে উঠে এল কিন্তু তখনি একটুকরা মেঘ এসে তাকে গ্রাস ক'রল, তরল শুভ্র জোছনা ক্রমে হ'য়ে এল গাঢ়, ম্লান ধূষর।

থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছিল আর বাংলোর সম্মুখের ছোট বড় গাছগুলির শাখায় শাখায় জাগছিল একটা ঘুম পাড়ানি শিহরণ।

ত্রিবিক্রমবাবু অনেক কিছুই চিন্তা করছিলেন। বার বারই আজ মনে হচ্ছিল তাঁর সহবাসী আর্টিষ্টটীর কথা।

সংসারে অজানা তার কিছু নাই এই ধারনাই ত্রিবিক্রমবাবু এতদিন পোষন ক'রেছেন কিন্তু এই আর্টিষ্টটীর সংস্পর্শে এসে আজ তাঁর চিন্তা যেন ভিন্ন পথ ধ'রেছে বলে তাঁর মনে হ'ল।

জীবনের পরম বন্ধু ও শত্রু সেই উগ্র যৌবন আজ বিদায় নিয়েছে তাই

হয়তো তাঁর এই পরিবর্ত্তন। অনেক কথাই আজ তাঁর মনে হ'তে লা'গল। অতীতের, তাই বর্ত্তমানের তাই ভবিষ্যতের।

এ জগতে অসম্ভব ব'লে কিছুই তাঁর কাছে কোন দিন ছিল না যখন তখন আজও তাঁর এই রূপান্তরে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। তবে এই রূপান্তরের প্রধান কারণ যে হেনা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই কারো থাকতে পারে না।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর ত্রিবিক্রমবাবু ব'লে উঠলেন : দাতা যদি বা দান করেন, বিধাতার তা আবার সহ্য হয়না, তিনি তার উপরও করেন কৃপনতা।

দরজার কাছ থেকে হেনা জিজ্ঞাসা ক'রল : কেন গো, কি হ'ল আবার?

-কি যে হ'য়েছে, বাইরে এলেই বুঝতে পা'রতে। তা' তোমার তো সময় হবেনা আর!

হেনা ব'লল : আর্টিষ্ট বন্ধুটীকে ছেড়ে আজ বুঝি মনটা বিগড়ে গিয়েছে?

ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন : সত্যিই! ছেলেটীকে আমার খুব ভাল লাগে। আর কিছু?

না, আর কি? ব'লে ত্রিবিক্রমবাবু নীরব হ'লেন।

কিছু সময় পরে চাঁদখানি আবার হেসে ভেসে উঠতেই ত্রিবিক্রমবাবু বলে উঠলেন : বা বা! কি সুন্দর রাত! নিজেকে আজ হারিয়ে ফে'লতে ইচ্ছা হ'চ্ছে গো··· কিন্তু

-কিন্তু কি? বাধা দিচ্ছে না কি কেউ?

হেনার কথায় ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন : তা একটু বাধা দিচ্ছে বৈ কি!

কে গো সেই সৌভাগ্যবতীটী? পরক্ষনেই হেনা আবার ব'লল : ভারী দায় পড়েছে বাধা দিতে। আমি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলা, তোমাকে হারালেও তোমার সম্পত্তিটা চালিয়ে নেবার শক্তি হারাব ব'লে মনে হয় না; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে নিজেকে হারাতে পার।

—হারিয়ে তো ফেলেছিই কিন্তু কুড়িয়ে এনে দেয় কে?

বটে! গোটা জীবনের সুখটুকু এই বয়সে আবার নতুন ক'রে ভোগ করা আর ভাল দেখায়না; বিশেষ অমুনি মেয়ের সামনে।

এ কথার উত্তর দেওয়া ত্রিবিক্রমবাবুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'ল। কিছু সময় নীরব থেকে এবার তিনি স্বর পরিবর্ত্তন ক'রলেন।

ব্যাপারটা কি জানো? দূরে ঐ পাহাড়ের পানে চেয়ে সত্যিই মনে একটু কবিতা জেগেছিল কিন্তু পরক্ষনেই বু'ঝলাম যে ওটা মায়া। ও সব নেহাৎই তোমার পিয়ুষরায়ের কল্পনার খোরাক। ধরা ছোঁওয়াই যায় না যা, জীবনে তার মূল্য কি! তার চেয়ে দু' একটী ফুল পেলে তার গন্ধটুকু উপভোগ করা যেত।......

নাঃ, পিয়ুষবাবুর বাহাদুরি আছে ব'লতে হবে, নইলে তোমার মাথাটী এমনি ক'রে খেতে যে কেউ পারবে এ আমি মনে ক'রতে পারিনি। যাক্, কি ফুল চাই তোমার, বল? গোলাপ, গন্ধরাজ, যুই, বেলা না চম্পা···কি চাই ব'লে ফেল চট্ ক'রে। এক্ষুনি আবার লীলা আসবে।

ব'লতে ব'লতে হেনা বাইরে বেরিয়ে এল।

ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: বুড়ো হ'য়েছি, 'হার্ট' দুর্ব্বল, অত সব 'ষ্ট্রঙ্গ' ফুলের গন্ধ আর সইতে পারিনা।

আরও একটু নিকটে সরে এসে হেনা ব'লল: তবে আর চাচ্ছিলে কেন? লোকে যে বলে বুড়ো হ'লেই লোভ বাড়ে সে কথাটা দেখছি মিছে না।

হেসে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: কথাটা খুব সত্যি, তবে একটা ফুল, যতো 'ষ্ট্রঙ্গ' হ'কনা আজকাল যেন সইতে পারছি ব'লে মনে হয়।

ত্রিবিক্রমবাবুর একথার মধ্যে ছলনা ছিলনা। তাঁর এই নতুন জীবন, নতুন কথা, চিন্তা এবং তার অভিব্যক্তি, সমস্তই এই তরুণীটীর নিকট হ'তে সম্ভ-লব্ধ ব'ললে সত্যের অপলাপ হয় না।

ত্রিবিক্রমবাবু হেনার একখানি হাত ধ'রে ব'ললেন : বোস, লীলা থাকে —সব সময়ে তো তোমাকে কাছে পেতে পারিনা।

ঝংকার দিয়ে হেনা ব'লে উঠল : থাকে কেন, দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারো না ! আমি হ'লে কবে বিদায় ক'রতাম। সব সময়ই কাছে কাছে,···ভাল লাগে না আমার !

ত্রিবিক্রমবাবু তাঁর তরুণী নববধুর মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পরে ব'ললেন : তোমার এই সাধ, তা' এতোদিন আমায় বলনি কেন ? আমি ভাবি ওর সঙ্গে তোমার এতো ভাব · ···

ভাব ? ছাই ভাব ! সৎ সন্তানের সঙ্গে আবার ভাব হয় না কি কারো ! —তাও বয়সে সমান। ওর জন্য আমি মুখ ফুটে কখনও একটা কথা ব'লতে পারলাম না।

হেনার কথায় ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন : আমি কিন্তু এতোদিনেও তোমাকে চিনতে পারিনি। সত্যি ব'লতে কি তোমাকে ভুলই বুঝেছি। শাস্ত্রের কথা মিছে হয়না দে'খছি, স্ত্রীয়াশ্চরিত্র······

থাক্ এখন ও কথা। কাজের কথা বলো দেখি ? ওকে পার ক'রবে কি না ?

ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন : পার ক'রতে তো আমার অমত নাই কিন্তু ...

হেনা বাধা দিল : কিন্তু কি আবার ?

ভাবি, যাদের সঙ্গে এতোকাল ধরে মামলা মকর্দ্দমা ক'রলাম······

এবারও হেনা বাধা দিয়ে ব'লল : কিন্তু তুমিই তো শুনেছি জিতেছ, তাকে ফকির ক'রে ছেড়ে দিয়েছ।

ত্রিবিক্রমবাবু ব'লতে লাগলেন : কিন্তু তুমি সে ছেলেকে চেনোনা, সে তার বাপের মত মোটেই নয়। ফকির হ'য়েও সে আমায় কম অপমান করেনি।

এ কথা হেনা আজ প্রথম শুনল, তাই সে বিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রল: কি করেছে সে?

ত্রিবিক্রমবাবু তখন তাঁর নামে ডাক্তারখানা স্থাপনের কথা বলে ব'ললেন: তবেই বোঝ সে কেমন ছেলে;—আর ও কি না আমার মেয়ে হ'য়ে সেই সংসারেই যেচে মাথা গলাল।

হেনা নতমুখে সুধার এই অপূর্ব্ব প্রতিশোধের কথাই ভাবছিল।

ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: ওর আমি বে-ই দেব আবার। কি হ'য়েছে আর তাতে? এই তো, ক'দিন আর বে হ'য়েছে!···

হেনা ব'লল: তোমার আমার আগে!

তা হ'ক্। আমি পিযুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে ফেলেছি। তার অমত নাই, এখন তুমি কোন রকমে লীলার মত করাতে পারলেই হয়। অমন স্বামী পেলে যে-কোনও মেয়েই সুখী হবে।

হেনা ব'লল: তা কেমন ক'রে হবে? আমি তা' পারবোনা।

ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: দেখ, এ কাজ খুব কঠিন নয়। ওকে পিযুষের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও দেখি; দেখবে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

—এমনিই ভাবো নাকি মেয়েদের?

না না, কতকটা অপ্রস্তুত হ'য়েই ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: না না, সকলের কথা বলছি না আমি। একবার তুমি চেষ্টা ক'রেই দেখ না। ক'দিনই বা বে হয়েছে,···দেখ যদি পারো।

হেনা ব'লল: কিন্তু আমি ব'ললেই সে শুনবে কেন?

ত্রিবিক্রমবাবু ব'লতে লা'গলেন: আহা! ব'ললেই কি আর শোনে কেউ! কৌশল ক'রে সব ক'রতে হবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে পিযুষের সঙ্গে একটু মেলা মেশা কর দেখি।

সুনিপুন অভিনেতার মত হেনা ব'লল: তা পারি কিন্তু একটা বড় ভয় ক'রে।

ত্রিবিক্রমবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন: কি?

কিছু সময় নীরব থেকে হেনা ব'লল: পিযুষবাবুর মত ছেলের সঙ্গে মিশতে কেমন যেন একটা ভয় হয়।

ত্রিবিক্রমবাবু সাশ্চর্য্যে ব'ললেন: ভয়! ভয় কিসের?

কিছু সময় নীরব থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে হেনা ব'লল: লীলা আর পিযুষবাবুর বে'র কথা তুমি যা ব'ললে সবই সত্যি কিন্তু আমি ভয় ক'রছি আর একটা।

হেনার কথায় ও ভাবে ত্রিবিক্রমবাবু বিস্ময় বোধ ক'রলেন। ব'ললেন: ব্যাপারটা কি বল দেখি?

লীলা তো শুনেছি প্রেম ক'রে বে' ক'রেছে, তাও আমাদের আগেই···

অধৈর্য্য হ'য়ে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: তোমার কি হ'ল তাতে?—

আমার তো তেমন কিছু নয়, তাই ভয় হয়, যদি লীলার জন্য পিযুষবাবুর সঙ্গে মিশতে গিয়ে নিজেরই একটা কিছু হ'য়ে যায় তখন··· ··

ত্রিবিক্রমবাবুর মনে হ'ল যেন এক বিষধর অতর্কিতে তাঁর বুকে দংশন ক'রল। চমকে উঠে হেনার মুখের পানে তাকিয়েই পরক্ষণে তিনি দৃষ্টি নত ক'রলেন।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর হেনা ব'লল: সত্যি কথা ব'লেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রলে?

ত্রিবিক্রমবাবু উত্তর ক'রলেন: না, রাগ করিনি। আজ তোমার কথায় আমি আমার এতোদিনের ভুল বুঝতে পেরেছি। এ আমার চিরদিনের স্বভাব;—যখন যে কাজ ক'রব ভেবেছি, তাই-ই করেছি। আর সেই একটা কাজের জন্য অন্য কতো অনর্থই যে এমনি ক'রে নিজেই সৃষ্টি করেছি,

তার ইয়ত্তা হয় না। খেয়ালের ঝোঁকে হিতাহিত জ্ঞান আমার থাকে না আমি বুঝি।

হেনা ব'লল: তুমি যদি পিয়ুষবাবুর সঙ্গেই ওর বে দিতে চাও; আমার আপত্তি নাই। আমি চেষ্টা ক'রতে পারি।

যাক্, ও কথা আর ব'লনা; আমার শিক্ষা হ'য়েছে।

তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: তবে সুধার কাছেই ওকে পাঠিয়ে দেই, কি বল? ব'লে তিনি হেনার পানে তাকালেন।

হেনা ব'লল: আমিও তাই বলি। তার বাপের সঙ্গে লাঠালাঠি ক'রেছ ব'লে কি তার সঙ্গেও ক'রতে হবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: অথচ, তুমি জাননা হেনা, সুধার বাবার সঙ্গে এককালে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

হেনা যেন কি ব'লতে যাচ্ছিল এমনি সময় লীলা এসে পড়ায় আর সে কথা বলা হ'লনা। লীলা ঘরের মধ্যে চলে' যেতে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: সুধা এখন কোথায়?

হেনা উত্তর ক'রল: আমি তো জানি না, তবে লীলা নিশ্চয়ই জানে; ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

* * * *

চাকুরি করার ইচ্ছা কোনও দিন নীলিমার ছিলনা কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেই তাকে এই হাসপাতালের কাজ নিয়ে বিহারের ক্ষুদ্র এই সহরে চ'লে আসতে হ'ল। বিশেষ সুধার অবস্থা চিন্তা করেই নীলিমার এই দাসত্ব নইলে নিজেদের হাতে-গড়া সেই নারীপ্রতিষ্ঠান ফেলে অন্যত্র এই নার্সের কাজ ক'রবার ইচ্ছা তো তার কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু না ক'রলেই বা চলবে কেন? একা সুধা কতো ক'রবে!

কিন্তু এই দূর প্রদেশে এসেও যেন নীলিমা শান্তি পায়না। দিবস রাত্রির প্রতিটী ক্ষণ মনে হয় তার রেবার কথা অন্যান্য সকলের কথা আর সে হ'য়ে ওঠে চঞ্চল। যে দিন সে লীলার জন্য ভাবতে গিয়েছিল, সে দিন সেই মুহূর্ত্তেই সে তার জীবনের ভবিষ্যৎ স্থির ক'রে ফেলেছিল।

হাতে সে কাজ করে কিন্তু অন্তরে চলে তার কোন্ সুদূরের লীলাখেলা সে স্মৃতি কখনও তাকে দেয় আনন্দ কখনও বয়ে আনে অবসাদ।

কিন্তু রোগীগুলি তাকে ছাড়তে চায় না।

মাদার নি' না দিলে ওষুধ যেন মনে হয় বেশী তিক্ত, রোগ হ'য়ে দাঁড়ায় আরও কঠিন। ফলে মাদার নি'কে নিয়ে রোগীদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনা কিন্তু নীলিমার দেহে যেন সবই সহ্য হয়। কথাটী মাত্র না ব'লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগিয়ে চলে সে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে তার কাজ নিয়ে।

বিনিদ্র চোখে রোগীর শিয়রে ব'সে ভাবে সে সুদূর কলিকাতার কথা, লেকের সে দিনের কথা। ‥ …

একদিন খেয়ালের বশে যাদের সে 'ড্রাইভ' ক'রে কৌতুক ক'রেছিল বিধাতার ইঙ্গিতে আজ সে তাদের সকলেরই জীবনের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কাণ্ডারী।

সহসা অদূরের কোন একটী রোগী রোগের জ্বালায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে: উঃ মাগো।

নীলিমা চমকে ওঠে। চিন্তা সূত্র ছিঁড়ে যায় তার খণ্ড ছিন্ন হয়ে, এস্ত পদে ছুটে যায় সে তার কাছে।

মাথায় বুকে হাত দিতেই রোগী শান্তিতে আবার চোখ বোজে, কম্পিত ওষ্ঠের ফাঁকে বেরিয়ে আসে একটা তৃপ্তির পরিচয়—আঃ।

সুনিপুন অভিনেতার মত হেনা ব'লল: তা পারি কিন্তু একটা বড় ভয় ক'রে।

ত্রিবিক্রমবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন: কি?

কিছু সময় নীরব থেকে হেনা ব'লল: পিযুষবাবুর মত ছেলের সঙ্গে মিশতে কেমন যেন একটা ভয় হয়।

ত্রিবিক্রমবাবু সাশ্চর্য্যে ব'ললেন: ভয়! ভয় কিসের?

কিছু সময় নীরব থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে হেনা ব'লল: লীলা আর পিযুষবাবুর বে'র কথা তুমি যা ব'ললে সবই সত্যি কিন্তু আমি ভয় ক'রছি আর একটা।

হেনার কথায় ও ভাবে ত্রিবিক্রমবাবু বিস্ময় বোধ ক'রলেন। ব'ললেন: ব্যাপারটা কি বল দেখি?

লীলা তো শুনেছি প্রেম ক'রে বে' ক'রেছে, তাও আমাদের আগেই···

অধৈর্য্য হ'য়ে ত্রিবিক্রমবাবু ব'ললেন: তোমার কি হ'ল তাতে?—

আমার তো তেমন কিছু নয়, তাই ভয় হয়, যদি লীলার জন্য পিযুষবাবুর সঙ্গে মিশতে গিয়ে নিজেরই একটা কিছু হ'য়ে যায় তখন·····

ত্রিবিক্রমবাবুর মনে হ'ল যেন এক বিষধর অতর্কিতে তাঁর বুকে দংশন ক'রল। চমকে উঠে হেনার মুখের পানে তাকিয়েই পরক্ষণে তিনি দৃষ্টি নত ক'রলেন।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর হেনা ব'লল: সত্যি কথা ব'লেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রলে?

ত্রিবিক্রমবাবু উত্তর ক'রলেন: না, রাগ করিনি। আজ তোমার কথায় আমি আমার এতোদিনের ভুল বুঝতে পেরেছি। এ আমার চিরদিনের স্বভাব;—যখন যে কাজ ক'রব ভেবেছি, তাই-ই করেছি। আর সেই একটা কাজের জন্য অন্য কতো অনর্থই যে এমনি ক'রে নিজেই সৃষ্টি করেছি,

এমনি ক'রেই নীলিমার 'ডিউটি' চলে। 'ডিউটি' শেষে ঘরে ফিরে সাথী শুধু তার এক চিন্তা আর বই। এমনি করেই তার দিন কাটে।

কিন্তু আজ সে চঞ্চল, অত্যন্ত চঞ্চল, যে চাঞ্চল্য এমন কি রোগীর দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিতে পারে না। এ চঞ্চলতার কারণ, আজ সংবাদপত্রে সে রেবার সংবাদ জানতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, সুধারও যে কোনও মুহূর্ত্তে ঐ অবস্থা হ'তে পারে। কারণ, তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

বুকে ব্যথা, চোখে জল, তা' থাকলেই বা; চাকুরি শুনবে কেন? তবুও সে হাউস-সর্জ্জেনকে গিয়ে জানাল যে সে আজ অত্যন্ত অসুস্থ; কোনও রকমে তাকে এই রাতটা ছুটি দেওয়া যেতে পারে কিনা! সার্জ্জেন উত্তরে ব'ললেন; দুঃখিত, আর সে সময় নাই। সকালে জানালেও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হ'ত; কিন্তু এখন হয় না, বিশেষ আজ রাত্রে কোনও পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। কাল প্রয়োজন হ'লে ছুটি হ'তে পারে। আজ তাকে থাকতেই হবে। ম্লান মুখে নীলিমা ওয়ার্ডে ফিরে এল। প্রয়োজন তার আজ, কাল ছুটি নিয়ে সে কী ক'রবে। আজ এমন কি হ'ল যাতে কোনও পরিবর্ত্তনই হ'তে পারে না, রাত্রের মাত্র কটা ঘণ্টা তো সে চেয়েছিল, তা-ও চলবে না, তাকে আজ থাকতেই হবে! একি জুলুম!

কিন্তু এই জুলুমের কারণ যখন সে জানতে পারল তখন সে তার ছুটি না-মঞ্জুর হওয়ার জন্য মনে প্রাণে ভগবানকে ডেকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল।

যখন সে 'চার্জ্জ' বুঝে নেয় তখন নার্স ব'লল যে তের নম্বর 'বেডে' একটা পুলিশের আসামী আছে।

পুলিশের আসামী শুনেই নীলিমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল কিন্তু যখন দেখল সে সত্য সত্যই সুধা তখন তার কী অবস্থা হ'ল তা' অবর্ণনীয়।

## ইঙ্গিৎ

ট্রেণেই সুধার জ্বর আসে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে তার জ্ঞান লোপ পায়। স্টেশনে গাড়ী আসতেই আরোহীরা দয়াপরবশ হ'য়ে স্টেশন মাষ্টারকে সংবাদ দেয়। স্টেশন মাষ্টার পুলিশের হাত দিয়ে তার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য এই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে একটা বড় রকমের পুরস্কারের ফর্দ্দ তৈরি ক'রতে ব'সলেন।

সুধার যখন জ্বর বিরাম হল তখন রাত অনেক।

চোখ মেলে তাকাতেই ললাটের উপর, দুটী গণ্ডের পাশে অনুভব করল সে কার যেন মায়াভরা একখানি স্নিগ্ধ স্পর্শ।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করল : কেমন লাগছে এখন ?

সুধা উত্তর করল : দিব্বি তোমার হাতের সেবাটী ভোগ করছি ; মন্দ লাগবে কেন ?

সুধার কথায় নীলিমার দুটী গণ্ড রক্তাভ হ'য়ে উঠল।

ক্ষণকাল পরে সুধার মুখের অতি কাছে সরে এসে চতুর্দ্দিকে একবার তাকিয়ে সে ব'লল : আপনাকে পালাতে হবে কিন্তু, পারবেন তো ?

সুধা বিস্ময়ে তাকাল তার পানে।

নীলিমা ব'লল : পালাতেই হবে আপনাকে। পেছনের ঐ জানালা দিয়ে পালিয়ে যান। ওদিকে পাহারা নাই।

তারপর ?

তারপর আবার কি ? দূরে কোথায়ো চলে যান।

তারপর, তোমার কি হবে ?

আমার ?

নীলিমা ব'লল : আমার আবার কি হবে ! আমি নার্স, পাহারাওলা নই তো ! তুমি যদি জোর ক'রেই পালিয়ে যাও তা হ'লেই বা আমি কি করতে পারি-।

সুধা দেখল নীলিমা যতো দৃঢ় স্বরেই কথাগুলি বলুক না কেন তার সমস্ত শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। তার হাত ধরে সুধা বলল: ব'সু এখানে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীলিমা বলল: আধ ঘণ্টা পরে একটা কলকাতার ট্রেণ আছে। তুমি প্রস্তুত হও।

বেশ। তোমার কথাই শুন্‌বো। লীলা এখানে; বাংলোতে আছে, তার সঙ্গে দেখা ক'র. সব ব'ল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ·····রোগীগুলি ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য। চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে নীলিমা বলল: একটু দেরী কর। আমি বাইরে যেয়ে নেই।

ব'লে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত রোগীদের পানে আর একবার চেয়ে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু বারান্দায় পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়াল।—যদি ধরা পড়ে, যদি কোনও রোগী দেখতে পেয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। নীলিমা সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতিটী মুহূর্ত্ত গনণা ক'রতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট পরে নীলিমা স্পন্দিত বক্ষে পা টিপে টিপে যখন আবার সেঘরের ভিতর প্রবেশ করল তখন কোথায়ো সুধার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। নীলিমার সমস্ত শিরা উপশিরা গুলিকে চঞ্চল ক'রে দিয়ে গেল একটা তীব্র শোণিতোচ্ছাস! ঝুপ্ ক'রে সে একটা চেয়ারের মধ্যে ব'সে পড়ল।

সুধার এই পলায়নে যে একটা চাঞ্চল্য জাগল সে কথা বলাই বাহুল্য তবে নীলিমাকে যে এ হাঙ্গামার মধ্যে জড়িত হ'তে হয়নি এটাই সুখের এবং আশ্চর্য্যের। অনুসন্ধানের ক্রটী হ'লনা—কিন্তু সুধা হ'য়ে রইল দুর্লভ।

অত্যন্ত সতর্কতা সত্বেও এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ডাক বাংলোর ঠিকানায় আসতে আরম্ভ ক'রল শুধু চিঠি আর টেলিগ্রাফ।

কলিকাতা হ'তে এক এক ক'রে বিজন সুলেখা, ডলি প্রতিমা তো

এলোই তা ভিন্ন এলো—মলয়া গুপ্ত, লাবণ্য সেন, শান্তি চক্রবর্ত্তী, ইন্দু-লেখা সেন, পারুল অনিমা অঞ্জলি দাশগুপ্ত, তটিনি মিত্র আরও কতো কে ; লীলা বা হেনা কেউই তাদের চেনেনা,—সকলেই সুধার শুভানুধ্যায়ী। বাংলো হ'য়ে উঠল সরগরম।

*　　*　　*

সেদিন সন্ধ্যায় সকলে বাংলোর বারান্দায় বসে। ত্রিবিক্রমবাবু এবং বিজন মাঝে মাঝে দু একটি কথা বলছিলেন নইলে অপরাপর সকলেই নীরব।

এমনি সময় নীলিমা আসতে হেনা ঘরের মধ্য হ'তে একখানি চিঠি এনে তার হাতে দিল।

তার নিকট পত্র লিখল কে! ভাবতে ভাবতে সে চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলল।

হেনা জিজ্ঞাসা করল : কে লিখেছে ?

কোন কথা না ব'লে নীলিমা চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে ব'লল : সুধাদা।

কে, কে ?

সকলের বুকের মধ্যেই যেন একটা প্রাণ, একটা সুর।

ত্রিবিক্রম বাবু ব'ললেন : সুধা লিখেছে ! পড় দেখি।

হেনা প'ড়ল :—

এখন আমি সিঙ্গাপুর। তুমি যখন এ পত্র পাবে তখন চ'লে যাব আরও দূর ! কিন্তু দূরে যতো বেশী চলেছি মনে তোমরা ততোই বেশী ক'রে আসন নিচ্ছ। লীলাকে ব'ল।—আমার জন্য শোক ক'রনা।

আমি চিরদিনই সুখী। আমার প্রাপ্য শাস্তি ও গ্লানি যে বরণ ক'রে নিয়েছে বার বারই মনে হ'চ্ছে আজ সেই রেবার কথা। যাক্, একদিন আমি আবার ফিরব কিন্তু আজ বিদায়। হ্যাঁ, লীলাকে ব'ল যে তাদের সুলেখা এই সুধারায়ের বোন···সহোদরা।—

তড়িৎস্পৃষ্টের মত বিজন ব'লে উঠল: কি কি? সুলেখা সুধারায়ের কি ··?

হেনা প'ড়ল: ···বোন···সহোদরা!

ম্লান গোধূলির মৌন মুহূর্ত্তে সুধা ও রেবার ব্যথায় সকলের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। কেউ কোনও কথা না ব'লে দূরে বাইরের পানে চেয়ে বসে রইল স্তব্ধ হ'য়ে।

—দূরে·· শালবনের ফাঁক দিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে রক্তিম সূর্য্য তখন আঁধারের বুকে অদৃশ্য হ'ল। অস্তমিত ঐ রক্তিম সূর্য্য···ওর পুনোরোদয়··· সেই আগামী কল্য······